ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২০১১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭ ২২০৪৯৮, **বিপণন বিভাগ** : ০১৯১৪-৩৮২১২৪
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার বিভাগ ।

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

সম্পাদকীয়

সার্বভৌমত্ব কার?

মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি। এ দুটিই আমরা এখানে দেখি, জানি ও উপলব্ধি করি। মানুষকে আমরা জানি একটি বুদ্ধিমান জীব। বিশ্বের মধ্যেই তার অবস্থান। বিশ্বের বাইরে তার অস্তিত্ব নেই। তার ক্ষমতা অতি সীমিত। বিশ্ব প্রকৃতির ক্ষমতার সহায়তায় সে কিছুটা ক্ষমতা চর্চা করে থাকে। এটাও অসীম ও অপরিমেয় নয়। কারণ তার জীবনের একটা মেয়াদ আছে। শুরু আছে শেষ আছে। এটাও তার জানার ও নাগালের বাইরে। যে কোনো মুহূর্তে এ বিশ্ব থেকে সে ছিটকে পড়তে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, সে একটা অসহায় জীব।

অন্যদিকে আছে বিশ্ব প্রকৃতি। মানুষ ছাড়া বাকি সবই বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরভুক্ত। পশু, পাখি, গাছপালা, পাহাড়, সাগর, নদী, সাগরে যা কিছু আছে, আকাশ, আকাশে যা কিছু আছে, চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিগুচ্ছ, মোটকথা আকাশে, বাতাসে, শূন্যে, মহাশূন্যে, ভূ-পৃষ্ঠে, ভূনিম্নে যেখানে যা কিছু আছে জীব, জড় বা শক্তি ও এনার্জি সবকিছুই বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরভুক্ত। সব কিছুই সৃষ্টি, এদের কারোর ক্ষমতা কম, কারোর বেশি তবে অশেষ নয়।

এ বিশ্বের বয়স হাজার হাজার লাখো লাখো কোটি কোটি বছর যাই হোক এর মধ্যে মানুষের আবাসের সূচনা কবে থেকে তা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মানুষের আগে বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি। বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে মানুষ লালিত হয়েছে। এর মধ্যেই তাকে জীবনের আবাস গড়ে তুলতে হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা নয়। বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষ কে কার ওপর কতটুকু কর্তৃত্ব করে বলা কঠিন হলেও উভয়ের ওপর উভয়ের কর্তৃত্ব একটি স্বীকৃত সত্য।

বিশ্ব প্রকৃতির একটা অংশ হচ্ছে পানি ও বাতাস। আর পানি ও বাতাস ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন। এ দুটো ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব থাকে না। তাছাড়া বাতাসের যে প্রচণ্ড শক্তি, পানিকে উড়িয়ে নেয় পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। মানুষের তৈরি যেকোনো স্থাপনাকে মুহূর্তে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে ভেঙ্গে খণ্ড বিখণ্ড ও চূর্ণ বিচূর্ণ করার অসাধারণ ক্ষমতা বাতাসের আছে। সাগরের টাইফুন, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি মানুষ প্রত্যক্ষ করছে অসহায়ের মতো। আবার পানি ও বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ পৃথিবীতে তার জীবনকে সহজ, সুন্দর ও উন্নততর করছে। বাতাস ও পানির ওপর কর্তৃত্ব করে মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীর দেশে দেশে নদী বাহিত পানির সয়লাব এবং ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আর এই সাথে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়

মানুষের জীবনের সব শান্তি বিনষ্ট করছে। এক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত বাতাস ও পানির তুলনায় মানুষ সর্বময় (sovereign) ক্ষমতার অধিকারী নয়। এভাবে সৃষ্টি জগতের অনেক কিছুর ওপর মানুষ প্রভুত্ব করতে পারে। কিন্তু তার কোনোটাই অসীম নয়। আবার উলটো তারাও মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার ও প্রভুত্ব করতে পারে। তুচ্ছ একটা মশাও মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। এমনি আমাদের ভাষায় 'মশা মারতে কামান দাগানো' প্রবাদের প্রচলন তো আছেই। এ অর্থেও মানুষ অসহায় জীব। মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিসর সীমিত।

তাছাড়া আর একটা ব্যাপার গভীর দৃষ্টি আকর্ষণীয়। মানুষের চিন্তা, যে জন্য মানুষ ফখর করে যে সে একটা অপরিমেয় ও অমূল্য সম্পদের মালিক, সেটা কিন্তু অপরিসীম নয়। চিন্তা মানুষকে সংকট উত্তরণের পথ দেখায় আবার বিভ্রান্তও করে। চিন্তা মানুষকে একা করে দেয়। সে কোনো পথ খুঁজে পায় না। এখানে এসে তার সার্বভৌম ক্ষমতার ধারা নস্যাৎ হয়ে যায়। এভাবে এ পৃথিবীতে এ বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে বহুক্ষেত্রে মানুষ অসহায়, তার কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বলে সে অনুভবই করতে পারে না–

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا -

'আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, আসলে মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।' (আন-নিসা : ২৮)

• ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ -

'আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন, সকল শক্তির আধার তিনি।' (আর-রূম : ৫৪)

এরপর আসে বিশ্ব প্রকৃতি। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে বিমুগ্ধ করে, প্রকৃতির শক্তি মানুষকে অবাক করে। পাহাড়, সমুদ্র, আকাশ, বিস্তীর্ণ বনানী, কী বিপুল শক্তির আধার! যেন শক্তির সীমাহীন এক দিগন্ত। শক্তি শক্তি এবং শক্তি কেবল শক্তিরই খেলা, অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য এক জগত। এ বিশ্ব প্রকৃতির এক একটি বস্তু এক একটি শক্তির আধার। আকাশে মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতে আনবিক ও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী মানুষ আতংকে শিউরে ওঠে। সাগরের সুনামির ধ্বংসকারিতা অবাক চোখে দেখা ছাড়া মানুষের আর উপায় থাকে না। তবুও বলতে হয় এগুলোর সবেরই একটা শেষ সীমা আছে। কোনোটাই অশেষ বা অসীম নয়। একদিন আকাশও নীরব এবং সাগর নিস্তরংগ হয়। সৌরজগতে সূর্য যতই তাপ বিকীরণ ও প্রভাব বিস্তার করুক না কেন তারও সীমা আছে। তার সার্বভৌম ক্ষমতার একটা সীমা রেখা আছে–

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ -

'সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষ পথে আবর্তন করে। এটা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।' (ইয়াসীন : ৩৮)

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর ও বিশ্ব প্রকৃতির এ ক্ষমতা মহান পরাক্রমশালী রব কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত। কাজেই বিশ্ব প্রকৃতির কারোর কোনো বাড়তি সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তার একচুল বেশি ব্যবহার করার ক্ষমতা তাদের কারোর নেই।

আসলে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতাকেই বুঝায়, যিনি সমস্ত ক্ষমতার স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক।

لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

'সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (তাগাবুন : ১)

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ -

'জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই।' (আরাফ : ৫৪)

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

'মহামহিমান্বিত সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (আল-মূলক : ১)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا -

'আল্লাহ এমন নন যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।' (ফাতের : ৪৪)

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ -

'আর আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে।' (আলে ইমরান : ৮৩)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ -

'আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায়।' (রা'দ : ১৫)

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

'বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করো আর যাকে ইচ্ছা হীন করে দাও। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (আলে ইমরান : ২৬)

এভাবে আমরা যদি সার্বভৌম ও সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল দিকে ক্ষমতার যত বিস্তার হতে পারে তার সমস্ত অঞ্চল ও সমস্ত উৎসের কথা বিবেচনা করি তাহলে আমাদের মানতে হবে কোনটাতেই আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কর্তৃত্ব এমনকি অস্তিত্বই নেই।

আল্লাহ্ যেখানে যাকে যতটুকু কর্তৃত্ব দিয়েছেন সে কেবল ততটুকুই প্রয়োগ করতে পারছে। এ প্রসঙ্গে মানুষের ক্ষেত্রে মশা মারতে কামান দাগার কথাতো আগেই বলেছি।

এক্ষেত্রে আমাদের শাস্ত্রে মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতার যে কথা বলা হয় তার অর্থ কি? এর দুটো অর্থই হতে পারে।

এক. আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহ্ তাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন।

দুই. আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের সৃষ্টিশীলতার গুণাবলির মাধ্যমে ক্ষমতার বলয়কে সে যতটুকু বিস্তৃত করতে পেরেছে।

আল্লাহ্ মানুষকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তার মধ্যে যদি তাকে সার্বভৌমত্বের অধিকারী না করেন তাহলে আল্লাহর কাছে মানুষের জবাবদিহিতা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। মানুষ তার কাজ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। কোনো কাজে আল্লাহ্ তাকে বেঁধে রাখছেন না। আল্লাহ্ তাকে প্রলুব্ধও করছেন না। সে নিজেই স্বেচ্ছায় নিজের বুদ্ধি বিবেক ও ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্ত কাজ করছে। এদিক দিয়ে মানুষ নিজের প্রত্যেকটি কাজের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সে জনগণের জীবন সুন্দর নিরাপদ ও শংকামুক্ত করার জন্য সংসদ গঠন করছে। সংসদে আইন প্রণয়ন করছে। দেশে আইনের শাসন কায়েম করছে।

এ দৃষ্টিতে বিচার করলে মানুষই হচ্ছে সংসদ। মানুষ ছাড়া সংসদের অস্তিত্ব নেই। কাজেই সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা মানুষকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো, সংসদ তার ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যাপারে তার পরিসরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীন। তার ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাইরের কোনো বাঁধা প্রতিবন্ধক নয়। যদি প্রতিবন্ধক হয় তাহলে সংসদ সার্বভৌম নয়।

দ্বিতীয়ত মানুষকে আল্লাহ্ সৃজনশীল গুণাবলির অধিকারী করেছেন। মানুষকে চিন্তা করার জন্য একটা মস্তিষ্ক দিয়েছেন। যেখানে চিন্তা করার ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। তার এ চিন্তাবলয়ের সীমা পরিসীমা সুদূর প্রসারী। মানুষের হাজার হাজার বছরে ইতিহাস এ চিন্তাবলয়ের বিকাশ ও বিস্তৃতির ইতিহাস। সভ্যতা সংস্কৃতি আইন এরি বিশদ রূপ। কাজেই এর ভিতরে মানুষ বহুদূর অবস্থান করতে পারে। এ অবস্থানেও সে পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারের প্রশ্নে তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

কাজেই নিসন্দেহে প্রমাণিত হলো মানষের সর্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন।

–আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

শিশু : আইনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম*

[সারসংক্ষেপ : শিশু মানব সভ্যতার রক্ষা কবচ। ইসলামী জীবন দর্শনে মানব সন্তান তথা মানব শিশু হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত ও আমানত। এ মানব শিশু পৃথিবীর আলোয় আগমনের পূর্ব থেকেই অনেকগুলো মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মলাভ করে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সুরক্ষায় ইসলামী আইন ও দর্শন আপোষহীন। আজকের জাতিসংঘ বা বিশ্ববিবেক শিশুদের যে সব অধিকার ও সুরক্ষার সনদ বা নীতি প্রণয়ন নিয়ে ভাবছে– সে সব বিষয় এবং শিশুর জন্য আরো অনেক কল্যাণকর বিষয় নিয়ে ইসলাম ঈসায়ী সপ্ত শতাব্দীতেই পরিপূর্ণ নীতিদর্শন উপস্থাপন করেছে। আজও বিভিন্ন দেশ-জাতি ও সমাজ শিশুর পরিচয় ও বয়সসীমা নির্ধারণ নিয়ে জটিলতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে শিশুর পরিচয়, আইনী ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রামাণ্য পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ হিসেবে শিশুর গুরুত্ব, মর্যাদা ও অবস্থান এবং শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বাস্তবানুগ ভূমিকা প্রমাণ করা হয়েছে।]

শিশুর পরিচয়

প্রত্যেক মানব শিশু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে পিতামাতা এবং মানবজাতির জন্য নিয়ামত। পৃথিবীতে মানব জাতি আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধি। মানব জাতির বংশধারা সুরক্ষার জন্য মানব-মানবীর বৈধ দাম্পত্য জীবনের ফসল হচ্ছে মানব শিশু। এ শিশুরাই মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ, মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ এবং পিতামাতা ও উম্মাহ'র সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "ধন-সম্পদ ও শিশু-সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা।"[১]

এই মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই কতিপয় মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে। ইসলাম শিশুর সেই সব অধিকার সুরক্ষায় নিশ্চয়তা প্রদান করে। শিশুর অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তথা ইসলামী জীবন-দর্শনে মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, প্রতিপালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে এ শিশুর পরিচয় তথা শিশু কাকে বলে বা কত বছর বয়স পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে সে সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর–১৭০৫

১. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا-

শিশু শব্দের আভিধানিক অর্থ– মানুষের শাবক।[২] 'লিসানুল 'আরব' গ্রন্থে শিশু[৩] الطفل অর্থ করা হয়েছে الطفل : الصغير من كل شيء "প্রত্যেক বস্তুর ছোটকে শিশু বলা হয়।" পরিভাষায়– الصبى يدعى طفلا حين يسقط من بطن امه إلى ان يحتلم "মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানবসন্তানকে শিশু বলে।"[৪]

বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত Shorter Oxford English Dictionary-তে শিশুর অর্থ বলা হয়– Childhood : The state or stage of life a child. The time during which one is a child the time from birth to puberty.[৫]

শিশুর সামগ্রিক সংজ্ঞা নির্ণয়ে ও নিরূপণে জাতীয় নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। জাতিসংঘ সনদের ধারা–১ এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৬] তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এ বয়সের মানব সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই ১৮ বছরের নিচে শিশু; যদি না দেশের আইন আরো কম বয়সের ব্যক্তিকে সাবালক হিসেবে অনুমোদন করে।[৭]

বাংলাদেশে জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ শিশু। অর্থাৎ, বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি

---

২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর 'বাংলা ভাষার অভিধান' এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রভৃতিতে শিশু বলতে বোঝানো হয়েছে অনূর্ধ্ব আট কিংবা ষোল বছরের বালক, পরবর্তীকালে সমবয়সী বালক-বালিকাসহ অনুর্ধ্ব ১৬ বছরের মনুষ্য সন্তানকে। তবে উইলিয়াম কেরীর `Dictionary of Bengali Language'-এ শিশুকে 'ইনফ্যান্ট'-এর সমার্থক বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "শিশু Form kk& to go by leaps, a child, an infant, aboy under eight years of age."

৩. আরবি ভাষায় শিশুকে الطفل এবং বহুবচনে الاطفال বলা হয়। অনুরূপ الطفل শব্দকে اطلفالة و الطفولية الطلولة و ইত্যাদিও বলা হয়। তাছাড়া الصى বহুবচনে الصبيان; الصغير বহু বচনেব الولد: বহুবচনে الأولاد; غلام বহুবচনে غلمان مولو কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে صبية বহুবচনে صبيات; الصغاى بنت বহু বচনে بنات, বিস্তারিত দেখুন, ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরূত : তা. বি. খ. ১১, পৃ. ৪০১

পবিত্র কুরআনে এসেছে–

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ -

আল-কুরআন, ৪০ : ৬৭

৪. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪০১

৫. Shorter Oxfort English Dictionary, Vol-1, 15th Edition, A-M, Newyork. Oxford University Press, 1993. P. 394.

৬. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা : ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭, পৃ. ৯

৭. ক্লাস্টার, রাইটস, *শিশু অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ*, ঢাকা : ইউনিসেফ, ১৯৯২, পৃ. ৮

৯৫ লাখ। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও চর্চা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশে তেমনটি হচ্ছে না। এখানে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মত শিশুর কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এ সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু ধরা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষাদানকারী সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের (যেমন, কাজ সম্পর্কিত) অধিকাংশতেই যে বয়স পর্যন্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা ১৮ বছরের বেশ নিচের, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্র ১১ বছর পর্যন্ত। আর একটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারণা এই যে, ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশব কালের সমাপ্তি ঘটে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে এ সব অসামঞ্জস্য এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন ও নীতির মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতির অর্থ হচ্ছে, অনেক শিশুই সনদ অনুসারে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে; যদিও তাদের সেটি পাওয়ার কথা।

তাছাড়া বাংলাদেশের শিশু বিষয়ক বিভিন্ন নীতি, সংবিধি ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়সভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে গরমিল দেখা যায়। বাংলাদেশে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে নিু বর্ণিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া আছে।

* ৭ বছরের নিচের শিশু	: কোনো অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।
* ৬-১০ বছরের শিশু	: সব শিশুকে স্কুলে পাঠানোর বিধান আছে।
* ১২ বছরের নিচের শিশু	: দোকান, অফিস, হোটেল বা কোনো ওয়ার্কশপের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। (শিক্ষানবীশ ব্যতীত)
* ১৪ বছরের নিচের শিশু	: কলকারখানার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
	: ভবঘুরেদের প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে।
	: জাতীয় শিশুনীতির আওতায় অধিকার সংরক্ষিত।
* ১৫ বছরের নিচের শিশু	: পরিবহণ খাতের কয়েকটি অংশের কাজের ব্যবহার করা যাবে না।
* ১৬ বছরের নিচের শিশু	: সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না।
	: মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না।
	: মেয়েরা যৌন মিলনে সম্মতি দিতে পারবে না।
* ১৮ বছরের নিচের শিশু	: মেয়ের বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
* ১৮ বছর বয়সে	: প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে।
	: ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।
* ২১ বছরের নিচে	: ছেলে বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
* ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে	: বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ, মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।[৮]

৮. ইসলাম, ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

জাতিসংঘ প্রদত্ত এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতির আলোকে শিশুর সাথে ইসলাম প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞায় আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্যের ক্ষেত্রটি হচ্ছে– ছেলে-মেয়ের বিবাহের বয়স। এরই নিরিখে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স-পরিমাণ আছে কিনা? বিবাহের জন্য কত বয়স হওয়া উচিত? তাছাড়া সরকারী আইনের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অভিমত কি? আধুনিক সমাজ-মানসে এ এক জরুরি জিজ্ঞাসা। কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের কিতাবে শিশুর বয়সসীমার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা খতিয়ে দেয়া যেতে পারে। আয়েশা রা.-এর উক্তি থেকে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। তিনি বলেন– تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بى وانا بنت تسعة سنين –

"রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে বিবাহ করেন, যখন আমার বয়স মাত্র 'ছয়' বছর। আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি 'নয়' বছরের মেয়ে।"[৯]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেন– أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة و هى صغيرة وكان عمرها ست سنين "নবী স. 'আয়েশা রা.-কে বিবাহ করেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।"[১০]

মহানবী স. নিজে যখন আয়েশা রা.-কে 'ছয়' মতান্তরে 'নয়' বছর বয়সে বিবাহ করলেন, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইসলামে ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোনো বয়সের ছেলে-মেয়েকে যে কোনো বয়সে বিবাহ দেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা আইনী র. ইবনে বাত্তালের নিম্নোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করেন– "ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার মেয়ের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয-বৈধ, সে মেয়ে দোলনায় শোয়া শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না যতক্ষণ তারা যৌন কার্যের জন্য পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ্য সম্পন্ন না হচ্ছে।" এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী র. লিখেন : اجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة "পিতার পক্ষে তার কুমারী (নাবালেগ) মেয়েকে বিবাহ দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত হয়েছেন"।[১১]

---

৯. মুসলিম, ইমাম, আস-*সহীহ, অধ্যায় :* বৈরূত, ইহ্ইয়াউত্ তুরাসিল আরাবি, তা.বি, খ. ২, পৃ. ১০৩৯

১০. আইনী, বদরুদ্দীন, *উমদাতুলকারী, সাহারানপুর, ইউপি : যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০৩, খ. ২০, পৃ. ৭*

১১. ইমাম নববী, আবূ যাকারিয়্যাহ মহীউদ্দীন ইবনে শারফ, *শারহু সহীহ লি-মুসলিম, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৫৬*

কাজেই মেয়েদের বা ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে কোনো বয়স নির্দিষ্ট করা যায় না। এ জন্য যে, সব মেয়ে শারীরিক অবস্থাও দৈহিক শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে সমান হয় না। এমনকি বংশ-গোত্র, পারিবারিক জীবন-মান ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। একারণে কোনো এক নীতি বা কোনো ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না। কাজেই ছেলে-মেয়ের বিবাহের জন্য কোনো বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং ঐ নির্ধারিত বয়স সীমার পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তাছাড়া বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ও এতদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা তো ছেলেমেয়েদের পূর্ণ বয়স্ক বালেগ-বালেগা অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় না। তবে বিবাহ বলতে যদি শুধু আক্দ ও ইজাব-কবুল বোঝায় তাহলে তা যে কোনো বয়সেই হতে পারে। এমনকি দোলনায় শোয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। ইসলামী শরীয়তে এ বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এবং এতে অশোভনও কিছু নেই।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস্-সিবায়ী লিখেন : চারটি মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের ইজতিহাদী রায় হচ্ছে, 'বালেগ' (সাবালক) হয়নি–এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ"।[১২]

আল-কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী স.-এর যুগে তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য।

রসূলুল্লাহ স.-এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে শিশুদের মুকাল্লাফ– শরীয়তের বিধিবিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়স সীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন– "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদার্পণ করতেই সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[১৩]

এ হাদীসের বক্তব্য থেকে শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুর নিু তম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ, শিশু শরীয়ত পালনের জন্য মুকাল্লাফ বা দায়িত্বশীল হবে দশ বছর বয়সে।

ফিক্হবিদগণের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে– যখন তার হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) হওয়া শুরু হবে। আর এর নিু তম বয়স সীমা বলা হয়েছে

---

১২. আস্ সিবায়ী, ড. মুস্তফা, *আল্-মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুনি, তা. বি., পৃ. ৫৭*

১৩. আবু দাউদ, ইমাম, সুলায়মান ইবনে আল-আশ, আস-*সুনান অধ্যায় :আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সালাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম*, ২০০০, *পৃ. ১২৫৯ দারুল ফিক্র তা.বি, খ. ১, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং ৪৯৫*

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أو لادكم بالصلاة وهم ابناء بيت سنين واضربو هم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ف المضاجع

কমপক্ষে 'নয়' বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।[১৪] এ ব্যাখ্যা থেকেও মেয়ে শিশুর মুকাল্লাফ হওয়া বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালত্বের নি¤তম বয়স 'নয়' বছর। শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পণের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। উপরিউক্ত নিদর্শন দেখা গেলে ছেলে-মেয়ে শিশুত্ব থেকে শরীয়তের মুকাল্লাফ হয়ে থাকে অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ হয় এবং শরীয়তের বাধ্যবাধকতা আরোপ হয়। তখন আর সে শিশু শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকে না।[১৫]

সাবালত্বের সীমা নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী ৭টি মতের উল্লেখ করেছেন–

১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থ্যবান হওয়া।

২. মনীষী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল-জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবলকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শরীয়তে শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

৪. আল্লামা ছুমামা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, সে আল্লাহ, রসূল, কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়– তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন (যুক্তিবিদ)-এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিকহবিদ-এর মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোনো কোনো ফিকহবিদ শিশুর সাবলকত্বের বয়স সীমা ১৭ বছর মনে করেন।

৭. কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ, সাবালকত্ব লাভ করবে না।[১৬]

---

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *আলমগীরী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি. খ. ১, পৃ. ৩৬

১৫. মুমেন, নূরুল, *মুসলিম আইন*, একাদশ অধ্যায়, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪২-১৪৩

১৬. ইবনে ইসমাঈল, আবুল হাসান আলী (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন 'আবদুল হামীদ সম্পাদিত, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, ২৩৫ আর্টিকেল, মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল-মিসরিয়্যাহ, আল-কাহেরা : ১৯৬৯, খ. ২, পৃ. ১৭৫

ইসলামী শরীয়তবেত্তাদের মধ্যে যেমন ইবনে শোবরুমা ও আল্-বাত্তী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি করে বলেন, ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের কোনো রকম বিবাহ প্রদান আদৌ বৈধ নয়। আর তাদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে উকীল হয়ে যে সব বিবাহ সম্পন্ন করে থাকেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল; তাকে বিবাহ বলে ধরাই যায় না।[১৭]

প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে বিবাহের আদেশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান, উপদেশ এ কথারই সমর্থক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দেয়ায় বাস্তবে কোনো কল্যাণ নেই। বরং আছে অনেক জটিলতা, তিক্ত সমস্যা ও বিপর্যয়।

শিশু বয়সের বিবাহের কারণে ছেলে-মেয়েদের জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে, সেজন্য বর্তমান সমাজ-মানসে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এর প্রতি প্রতিরোধ জেগে উঠেছে। এ কাজকে আজ অনেকে ভাল এবং সমর্থনযোগ্য মনে করতে পারছে না।

তাই বলে বিবাহের একটা নির্দিষ্ট বয়স ধার্য করা এবং তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠানকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করে দেয়া; এমনকি যদি কেউ তা করে সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে জেল-জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মানবীয় নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এ কাজ সমীচীন নয়।

তবে ধর্মীয় নৈতিক মানের অবক্ষয়ের সাথে এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজেও বাল্য বিবাহ এমনকি অসম বিবাহ অর্থাৎ, অল্প বয়সের মেয়েকে বুড়ো বয়সের পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়ার এবং বিবাহ করার প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ফলে সমাজে এর বিরূপ প্রভাব এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, সমাজের সুস্থতা এবং শিশুমাতা ও তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে আইনের সাহায্যে এ কাজকে নিরুৎসাহিত করার দাবি রাখে।

অনুসিদ্ধান্ত

উক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিসংঘ প্রদত্ত শিশুর সংজ্ঞা বলতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু আইনের দৃষ্টিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা একেবারে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শরীয়তের মুকাল্লাফ-দায়িত্বশীল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে-মেয়েকে শিশু বলা যাবে। মোটকথা যার ওপর শরীয়তের বাধ্যবাধকতা নেই সেই শিশু।

রাষ্ট্রীয় বিধানে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এবং শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য যে আইন করা হয়েছে তা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই; যদি তা ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ও কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট শিশু আইনের সংজ্ঞা বাধ না সাধলে তাতে

---

১৭. আব্দুর রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯

কোনো ক্ষতি নেই। অতএব স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণকারী একক কোনো আইনের অস্তিত্ব না থাকায় কেউ শিশু কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনের নিরিখেই নির্ধারণ করতে হবে।

ইসলামী নীতি দর্শনে শিশুর অবস্থান ও মর্যাদা

আজকের শিশু মানবতার ভবিষ্যৎ, জাতির আগামী দিনের স্থপতি। সুন্দর ও সভ্য জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন সুন্দর পরিবেশ যেখানে জাতির ভবিষ্যৎ স্থপতিগণ সকল সম্ভাবনাসহ সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক ও মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। এসব নিয়ামতের মধ্যে শিশু-সন্তান অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সে জুড়ি থেকে তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের দিয়েছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[১৮]

একজন নারী এবং পুরুষের বৈধ দাম্পত্য জীবনের আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে মানব শিশুর মাধ্যমেই। তাই শিশু-সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের পুতঃপবিত্র পুষ্প বিশেষ। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তান আল্লাহ্ তাআলার সেরা উপহার। সন্তান ঘরের শোভা, খায়ের ও বরকত এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের বাহন। শিশু-সন্তান পার্থিব জীবনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শিশুর মর্যাদা ও মূল্য মানবজীবনে সীমাহীন। পবিত্র কুরআনে ব্যাপারটি এভাবে বলা হয়েছে– "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির বাহন।"[১৯]

আল্লামা আলূসী র. এর ব্যাখ্যায় বলেন– ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ সুরক্ষার মাধ্যম।"[২০] শিশুদের যথার্থ মর্যাদা দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশু অধিকারের নিশ্চয়তা। এ জন্য শিশুর প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য অনুধাবন ও নিরূপণ। শিশুর অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়; সন্তানকে নিজের ও মানবতার জন্য আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন।

---

১৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৭২
وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ -

১৯. আল-কুরআন ১৮ : ৪৬
ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

২০. আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল্‌জীম ওয়াস আল-হুসাইনী : *রূহুল মাআনী*, বৈরূত : দারুস সাদির, তা. বি. খ. ১১. পৃ. ১২৭

শিশুর অস্তিত্বের সঠিক মূল্য দিতে না পারলে অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করা যাবে না অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগই পাওয়া যাবে না। কিংবা সুযোগ এলেও তার অধিকার আদায়ে সফল হওয়া যাবে না। কাজেই শিশুর সঙ্গে সঠিক আচরণের জন্য তার যথার্থ মর্যাদা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। পৃথিবীতে অগণিত মানুষ রয়েছে যাদের সম্পদের অভাব নেই, কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন সন্তান নেই। হাজার চেষ্টা-সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার অনেক মানুষ এমন আছে, যারা কামনা না করেও বহু সন্তানের পিতা-মাতা, কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই। কাজেই কারো সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা–

"নভোজগত ও ভূ-জগতের আধিপত্য কেবলমাত্র আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা শিশু উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[২১]

মানুষ যত বিত্ত বৈভব ও বৈষয়িক শক্তি-ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দান তো দূরের কথা তার ইচ্ছায় নিজ সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাও তার নেই। এরপরও যদি কেই আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তি বা সত্তার কাছে সন্তান কামনা করে কিংবা তাকে সন্তানদাতা বলে বিশ্বাস করে, তার মত হতভাগ্য ও অপরিণামদর্শী আর কেউ নেই।

সন্তানই দীনি কাজের সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকারী। দীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের সন্তানই উত্তরসুরী। এজন্যই নবী-রসূলগণ আল্লাহর দরবারে কামনা করতেন– "হে আমার রব! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে। আর হে প্রভু! তাকে একজন পছন্দীয় মর্যাদাবান মানুষ বানাও।"[২২]

অর্থাৎ, ইয়াকুব আ.-এর পরিবার থেকে দীনের যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নির্বাপিত হতে দেবে না। সন্তান কামনায় আরও একটি প্রার্থনা থেকে সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য যে কত বেশি তা স্পষ্ট হয়ে

---

২১. আল-কুরআন, ৪২ঃ ৪৯-৫০
لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ -

২২. আল-কুরআন, ১৯ : ৫-৬
فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

যায়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– "হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য এমন জুড়ি ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন শীতলকারী এবং আমাদেরকে কর মুমিন-মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য নেতা।"[২৩]

আরও একটি প্রার্থনা– "হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।[২৪]

সুসন্তান দুনিয়াতে যেমন মান-মর্যাদার মাধ্যম তেমনি পরকালীন জীবনেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে। কারো জীবদ্দশায় যদি শিশু-সন্তানের মৃত্যু হয় এবং সে ইহলোকে যদি সবর ও ধৈর্যের সাথে শোক সহ্য করে, তাহলে ঐ শিশু-সন্তান আখেরাতের প্রত্যাশিত জান্নাতের ওসিলা এবং বিপুল সম্মানের অধিকারী হবে। তার জন্য জান্নাতে এক বিশেষ মহল তৈরি হবে এবং ঐ মহলের নাম হবে 'শোকরের মহল' বায়তুল হামদ। আবু মূসা আল-আশআরী রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– "যখন কোন বান্দার শিশু-সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ্ ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার শিশু সন্তানের রূহ কবয করে নিয়েছো? ফিরিশতারা জবাব দেন, জী-হাঁ, কবয করে নিয়েছি। আল্লাহ্ বলেন, তখন আমার বান্দা কি বলেছে? ফিরিশতারা জবাব দেন, প্রভু! তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

"আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী"[২৫] পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে তাঁর বান্দার জন্য জন্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম 'শোকরের মহল' রাখার নির্দেশ দেন।"

হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, শিশু-সন্তান পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবে। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও সু-সন্তানের আমল এমন এক সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে, যার সওয়াব দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তাদের আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। হাদীস থেকে জানা যায় মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথে মানুষের আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি সু-সন্তান রেখে যায় তাহলে তা এমন এক নেক আমল হবে যার সওয়াব লেখা হতে থাকে অনন্তকাল।

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু-সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য অপরিসীম।

---

২৩. আল-কুরআন, ২৫ঃ ৭৪

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -

২৪. আর-কুরআন, ৩ : ৩৮

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ -

২৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৫৬

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ইসলামী নীতিদর্শনে শিশুর গুরুত্ব

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা হয়ে থাকে। কেননা সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য উপাদান পরিবার। পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী-মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে। পবিত্র প্রশান্তিময় দাম্পত্য জীবনের উষ্ণ আবেদন ঘন সান্নিধ্যের ফলশ্রুতি হলো শিশু-সন্তান। তাঁর দয়ার, কল্যাণে, স্নেহ-মমতার ফলশ্রুতিতেই গড়ে উঠেছে এ মায়াময় বিশ্ব-সংসার। দাম্পত্য জীবনে কেবল যৌন জীবনের পরম শান্তি, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা ও পরিতৃপ্তিই চূড়ান্ত লক্ষ নয়। বরং মানব বংশ রক্ষাকারী সদ্যজাত শিশু-সন্তানদের আশ্রয়দান, তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন, সুরক্ষা এর পরম ও বৃহত্তম লক্ষের অন্যতম। শিশু হচ্ছে সুসংবাদ ও সৌভাগ্যের পরম প্রাপ্তি। পবিত্র কুরআনে হযরত যাকারিয়া আ. ও তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান ইয়াহইয়া আ.-এর প্রসঙ্গ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "ওহে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের; যার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতঃপূর্বে আর কাউকেই এ নামধারী করিনি।"[২৬]

ইসলাম যে শিশু-সন্তানের প্রতি কত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ্ তাআলার শিশুর নামে শপথের মধ্যে। আল্লাহ্ নিজেই শিশুর নামে শপথ করেছেন এভাবে– "না, আমি এ নগরীর নামে শপথ করে বলছি, যখন তুমি এ নগরীতে অবস্থান করছো। আর শপথ করছি জন্মদাতার নামে এবং তার ঔরসে জন্মপ্রাপ্ত শিশু-সন্তানের নামে।"[২৭]

শিশুদের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে মহানবী স.-এর হৃদয় জুড়ে ছিল শিশুদের প্রতি প্রবল ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা। তিনি বলেন– "তোমরা শিশুদের ভালবাসো এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো।"[২৮]

তিনি আরো বলেন– "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরপ্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের কেউ নয়।"[২৯]

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ স. যখন বিজয়ী বেশে মক্কানগরীতে প্রবেশ করেন, তখন উটের উপর তাঁর সাথে ছিল একজন শিশু এবং একজন কিশোর। শিশুটি ছিলো

---

২৬. আল-কুরআন, ১৯ : ৭

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا -

২৭. আল-কুরআন, ৯০ : ১-৩

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ - وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ - وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ -

২৮. করিম, সিরাজুল, *মহানবীর শিশু প্রীতি*, ঢাকা : রুমা প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ২০

২৯. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, *বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী*, *১৪২১হি. খ. ৪. পৃ. ৩২১*

রসূলুল্লাহ স.-এর বড় মেয়ে জয়নাব রা.-এর শিশু পুত্র আলী রা. ও কিশোরটি ছিল উসামা রা.। নবী নন্দীনী ফাতিমা রা.-এর শিশু পুত্র হাসান ও হুসাইন রা.-কে রসূলুল্লাহ স. যে কত গভীর ভালবাসতেন ইতিহাসে এর বহু ঘটনা উল্লেখিত আছে। রসূলুল্লাহ স.-এর এ শিশু প্রীতি কেবল নিজ পরিবারের বা অতি প্রিয় সাহাবীদের শিশুর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না সকল শিশুর ব্যাপারেই তাঁর ছিল সমান দরদ। নবী স. শিশুদের কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন– "আমি সালাত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় দাঁড়াতাম, কিন্তু যখন কোনো শিশুর কান্না শোনতাম তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতাম যাতে মায়ের কষ্ট না হয়।"[৩০]

হাদীসে আরো আছে– "একবার আকরা ইবনে হাবিস রা. রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর দুই নাতি ইমাম হাসান ও হুসাইনকে চুমু দিচ্ছেন। তিনি নবী স.-কে বললেন, আপনি আপনার মেয়ের ছেলেদের চুমু দিচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! আমার দশ দশটি সন্তান রয়েছে, এদের কাউকেই আমি কোনো দিন চুমু দেইনি। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন– "আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাতে আমার কি দোষ?"[৩১]

ইহকালীন জীবনের জন্য যেমন শিশু সন্তানের গুরুত্ব রয়েছে, ঠিক পরকালীন জীবনের জন্যও শিশুদের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– "যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁদের সন্তানরাও ঈমানের পথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাঁদের সে সন্তানদের আমরা তাঁদের সঙ্গে জান্নাতে একত্র করব।"[৩২]

এতে শিশু সন্তানকে সুসন্তান ও ঈমানের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এতে শিশু সন্তানকে সুসন্তান ও ঈমানের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–
"সদা প্রস্তুত জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে, আর তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুণ্যবান হবে তারাও।"[৩৩]

---

৩০. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-আযান, অনুচ্ছেদ : মান আখাফ্‌ফাস্-সালাতা ইনদা বুকাইস সাবিয়ী, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৫০;

عن عبد الله بن ابى قتادة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انى لأقوم فى الصلاة فأسمع بكاء الصبى فأوجز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه

৩১. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ফাদায়েল, অনুচ্ছেদ : রহমাতু রসূলিল্লাহ স. আস্-সিবইয়ানা ...., প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮০৮

عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاء اعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلن الصبيان فما نقبلهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أو أملك لك إن كان نزع الله قلبك الرحمة -

৩২. আল-কুর্‌আন, ৫২ : ২১

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -

৩৩. আল-কুরআন, ১৩ : ২৩

جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ -

এদের জন্য ফিরিশতাদের একটি প্রার্থনা উল্লেখ করে কুরআনে এসেছে– "ওহে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে সদা প্রস্তুত জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ। আর তাদেরকেও যারা তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে নেককার হবে।[৩৪]

শিশুর সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর এটা ঈমানের পূর্ণতার গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচিত। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ স. বলেন– "মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমান সে লোকই লাভ করেছে যার চরিত্র সর্বোত্তম এবং যিনি পরিবারের লোকদের সাথে কোমল আচরণকারী।"[৩৫]

আল্লাহ নিজেই যখন নেককার সন্তানদেরকে জান্নাতী পিতা-মাতার সঙ্গে পরকালে একত্রে বসবাস করার প্রতিশ্রুত দিয়েছেন, তখন সন্তানদেরকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে শিশু-সন্তানের গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের মূলনীতিসমূহে শিশুর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে, শিশু বিষয়ক যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে শিশুর মা-বাবা, দেশের সংসদ, আদালত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষসমূহ শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে।"[৩৬]

বস্তুত মানব শিশু তথা সকল প্রাণীর বাচ্চা এমনকি উদ্ভিদ জগতের জন্ম ও সৃষ্টি কৌশল আল্লাহর এক সীমাহীন কুদরত। মানবীয় প্রচেষ্টা এখানে অকার্যকর। পৃথিবীতে মানব প্রজন্মের ধারা এবং নারী ও পুরুষের ভারসাম্য রক্ষার্থে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অন্যতম সৃষ্টি এ মানব প্রজন্ম তথা মানব শিশু। মানব শিশুর জন্মদান মানুষের ইচ্ছায় হয় না, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

মানব শিশুর গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে তাদের প্রতি যথার্থ আচরণ ও ব্যবহার করা সকলের দায়িত্ব। আধুনিক ভোগবাদী চিন্তাধারায় মানুষের সুখ-শান্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানব শিশুর প্রতি নানা রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। অনেক দম্পতি স্বাস্থ্যহানি ও ভোগের সুযোগ কমে যাবে মনে করে সন্তান গ্রহণ করতে চায় না। অনেকে তো বিয়ে করতেও রাজি নয়। তারা চায় বিবাহ বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল

---

৩৪. আল-কুরআন, ৪০ : ৮

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ -

৩৫. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফী ইস্তিকমালিল ঈমান ...... খ. ৫, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৬১২, পৃ. ৯ :

عن عائشة قالتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اكمل المومنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفهم باهله

৩৬. র‍্যাচেল কবির, *শিশুদের অধিকার আমাদের অঙ্গীকার*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮, পৃ. ৫

জীবন। বিয়ের বন্ধন ছাড়াই তারা যৌন জীবন আগ্রহী। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের কারণে এসব অবৈধ কাজ অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে গেছে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ও মুসলমানের সুসন্তান কামনাই স্বাভাবিক। একজন ভাল মানুষ অবশ্য শিশু-সন্তানের উজ্জ্বল সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে। কাজেই একজন ভাল মানুষের কাছে মানব শিশুর গুরুত্ব অপরিসীম।

শিশু মানব সভ্যতার রক্ষা কবচ

ইসলামী সমাজ দর্শনে মানব বংশধারা, অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তারের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য জীবন। এ দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির বংশ বিস্তার ও মানব সভ্যতার অগ্রায়ণ। মানব শিশু মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। মানব সভ্যতার সূচনা ও বিকাশের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে– "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং দু'জন থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী।"[৩৭]

আল-কুরআনে আরো এসেছে– "তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে প্রাণীকুলের মধ্যেও তাদেরই স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।"[৩৮]

আরও বলা হয়েছে– "তিনিই সেই মহান সত্তা (আল্লাহ), যিনি পানির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে মানুষকে বংশক্রম ও শ্বশুর সম্পর্কিত আত্মীয়তার ধারবাহিকতার ভিত্তিতে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।"[৩৯]

কুরআনের আয়াতে আরো আছে– "হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তোমাদের সজ্জিত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।"[৪০]

উপরিউক্ত আয়াতের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবতা ও মানব সভ্যতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মানুষ দিয়ে। পরে তাঁরই অংশ থেকে তার জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দু'জনের পবিত্র দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতি হিসেবেই বিশ্বময় এত অসংখ্য পুরুষ ও নারী অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ

---

৩৭. আল-কুরআন, ৪ : ১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً -

৩৮. আল-কুরআন, ৪২ : ১১

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ -

৩৯. আল-কুরআন, ২৫ : ৫৪

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا -

৪০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ -

থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মানব বংশধারার বিস্তার ও মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ হচ্ছে মানব শিশু। মানব শিশুর উৎসস্থল হচ্ছে পুরুষ-নারীর দাম্পত্য জীবন। এ দাম্পত্য জীবনকে তথা নারীকে উৎপাদনক্ষেত্র স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে– "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য উৎপাদনক্ষেত্র স্বরূপ।"[৪১]

ক্ষেত বা খামারে চাষাবাদ ও বীজ বপণের লক্ষ্য হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বিশেষ একটি ফসলের বংশবৃদ্ধি ও বংশের ধারা রক্ষা। অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকেরা মানব-বংশরূপ ফসলের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব বংশের বিস্তার ও অস্তিত্ব রক্ষা, তথা মানব সভ্যতার সুরক্ষা। মানব-মানবীতে যদি দাম্পত্য জীবনের অভাব ঘটে তা হলে মানবতা ও সভ্যতা সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটবে। এ ধারা বন্ধ করে দেয়া হলে মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

মানব শিশুর সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যে পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে যে সম্পর্কের চিত্র লক্ষ করা যায় তা অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। সন্তান সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতা তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদের কোনো দায়িত্বই বহন করতে চায় না। ঘর থেকে তাদের বের করে দেয়। এমনকি তখন সন্তান যদি পিতার ঘরের কোনো কিছু ব্যবহার করে, তা হলে তাকে সে জন্য দস্তুরমত ভাড়া দিতে হয় এবং একজন ভাড়াটের মতই তাকে সেখানে থাকতে হয়। এমনকি বিবাহ শাদীর ব্যাপারেও পিতামাতা কোনো দায়িত্ব বহন করতে রাজি হয় না। সন্তান যাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক এ ব্যাপারে পিতা-মাতার কোনো মাথা ব্যাথা বা দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানব শিশুর সাথে আচরণ সম্পূর্ণ মানবিক। সন্তান-সন্ততিকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা এবং কন্যা-শিশু হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। এমনকি সারা জীবন পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এক গভীর স্নেহ-মমতা, ভক্তিশ্রদ্ধা এবং আর্থিক প্রয়োজন পূরণে পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মানব শিশুই সভ্যতার রক্ষাকবচ।

শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দর্শন

মানব শিশু মানবতার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিরাট নিয়ামত বা দান। সে দানের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামে কৃতজ্ঞতা বা শোকর আদায় বলতে বোজায়-দানকৃত বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার, যাতে আল্লাহ নিয়ামতের প্রবাহ অব্যাহত রাখেন। আল্লাহর রহমত ও নি'য়ামতের অব্যাহত প্রবাহের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইবরাহীম আ.-এর ঘরে এক এক করে দু'জন মহামানব ইসমাঈল আ. ও ইসহাক আ. আবির্ভূত হয়েছিলেন। আল্লাহর প্রতি নিজের

---

৪১. আল-কুরআন, ২ : ২২৩

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ

শিশু সন্তানের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিল– "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার রব অবশ্যই প্রার্থনা শোনেন।"[৪২]

অপর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে– "হে আমাদের রব! আমি আমার শিশুদের তোমারই সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যবিহীন অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে গেলাম। প্রভু, সেখানে তারা সালাত কায়েম করবে। তুমি মানবজাতির হৃদয়কে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এবং তাঁদেরকে ফলমূলের আহার্য সরবরাহ করো। অবশ্যই তারা তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী থাকবে।"[৪৩]

মানব শিশুর জন্য ইসলামের অবদান হলো পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাতে সন্তান সমাজে-সংসারে সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।

ইসলামই প্রথমে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। প্রাচীন সমাজে যেখানে শিশু সন্তানকে অপাংতেয় মনে করা হতো সেখানে ইসলাম ঘোষণা করেছেন– "আর্থিক অনটনের জন্য তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে যেভাবে জীবিকা দান করি তাদেরকেও অনুরূপভবে দান করবো।"[৪৪]

এ কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অন্য একটি আয়াতে– "অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদর শিশুদের হত্যা করো না, আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিয্‌ক দান করি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[৪৫]

এভাবে মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সর্বপ্রথম অবদান হলো বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান। আর বেঁচে থাকার অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার যেমন স্বাস্থ্য রক্ষা, খাদ্য-পানীয় এবং বাস-উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিন্ত করা। ইসলামের নির্দেশ হলো, সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা যথাবিহিত ব্যবস্থা করা। ইসলামী নিয়মনীতি অনুসারে শিশু সন্তানের খাওয়া-দাওয়া, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, প্রতিপালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার তত্ত্বাবধান প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরয)।"[৪৬]

---

৪২. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৯

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ -

৪৩. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭

رَبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ -

৪৪. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلٰدَكُم مِّنْ إِمْلٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

৪৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا -

৪৬. *জাওয়াহিরুল কালাম*, আল্লামা সাইয়েদ ইবন হাসান নাজাফী-এর বরাতে, উসূলুত্ তারবিয়াহ (বাংলা অনুবাদ), তা.বি., পৃ. ২৫

মানব শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অন্যতম প্রধান অবদান হলো শিশুদের সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ইসলাম শিশুর অভিভাবকের ওপর দায়িত্ব দিয়েছে শিশুদের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে যাকারিয়া আ. আল্লাহর কাছে যে দুআ করেন। তাঁর ভাষা ছিল–

"হে রব! তুমি আমাকে এমন উত্তরাধিকার দান কর যে আমার এবং ইয়াকুব বংশের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং হে প্রভু! সে যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়।"[৪৭]

আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে– "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শেখানোর চাইতে আর কোন মূল্যবান পুরস্কার দিতে পারে।"[৪৮]

সন্তানের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করার লক্ষ্যে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সুনাগরিকও সচ্চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমেই একজন মানব শিশুর সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে সন্তানকে সমাজের কাছে বরণীয় এবং মানব জাতির গৌরব হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারাই হচ্ছে শিশুর আসল মর্যাদাদান। সন্তানকে তার সমসাময়িক রীতি ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে উঁচু পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানব শিশুকে মর্যাদাবান, কর্মকুশলী, দক্ষ, সুশীল ন্যায়পরায়ণ, নিয়ম শৃঙ্খলানুবর্তী, আদর্শরূপে গড়ে তোলা। আর ইসলাম এ কাজগুলোরই দায়িত্ব দিয়েছে পিতামাতা ও অভিভাবককে তারা সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে যেন গৌরবময় জীবনের অধিকারী করে তোলে। এ কাজে সামান্য গাফলতি করাকে তিরস্কার করা হয়েছে। লুকমান আ. তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে সন্তানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি। আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– "স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তাঁর পুত্রকে বললো, হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। অবশ্যই শিরক চরম জুলুম।"[৪৯]

তারপর লুকমান আ. বলেন– "হে আমার পুত্র! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা থেকে পাহাড়ের গর্তে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন।"[৫০]

---

৪৭. আল-কুরআন ১৯ : ৫-৬

فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

৪৮. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : বিররু ওয়াস্ সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফি আদাবিল অলাদি, খ. ৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮ حدثنا ايوب بن موسى عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مانحل والد ولدا من نحل أفضل من ادب حسن

৪৯. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

وَإِذْ قَالَ لُقْمَـٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

৫০. আল-কুরআন, ৩১ : ১৬

يَـٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

এরপর লুকমান আ. আরো বলেন– "হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[৫১]

লুকমান আ. আরো বলেন– "অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধৃত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৫২]

তিনি আরো বলেন– "পদচারণা কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু রাখো। সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।"[৫৩]

লুকমান আ.-এর উল্লিখিত উপদেশ ও কার্যকর শিক্ষাকৌশলও শিক্ষার বিষয়বস্তু ভিত্তিতে আমাদের শিশুদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে শিশুর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অভূতপূর্ব অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার : এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানব প্রজন্মকে শিশু বলে। এটা ইসলামী দৃষ্টিকোণ। আর সাধারণ আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বছর বয়সের নিচে সকল মানব প্রজন্মই শিশু। অবশ্য এক্ষেত্রেও দেশের ও প্রচলিত বিভিন্ন প্রেক্ষিত বরং কর্মপরিসর বিবেচনায় শিশু আইনে বয়সের তারতম্য লক্ষণীয় যা নিবন্ধে সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ধর্মীয় প্রেক্ষিত এবং জবাবদিহিতা বিবেচনায় ইসলামী দর্শনে যে কথা বলা হয়েছে তা সর্বকালের সর্বদেশের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি। ইসলামের নীতি অগ্রাহ্য করে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুর বয়সকে টেনে নিয়ে প্রয়োগ করলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইসলামী শরীয়তের যা কিছু বলা আছে সে গণ্ডিতে-ই থাকার মধ্যে মানবতার কল্যাণ নিহিত। মুসলিম সমাজের বাল্যবিবাহ যেমন ইসলাম সমর্থিত নয়; তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ফসল শিশুমাতা ও কুমারীমাতায় সয়লাব সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

---

৫১. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ-

৫২. আল-কুরআন, ৩১ : ১৮

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-

৫৩. আল-কুরআন, ৩১ : ১৯

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ-

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশর জনগণ ধর্মপ্রাণ ও ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত। জনগণের দাবি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এদেশে বর্তমানে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক[১] ও ১২টি প্রচলিত ব্যাংক পৃথক শাখা খুলে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শরীআহর নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ ইতোমধ্যে একটি অনন্য সফল ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ গবেষণায় ব্যাংকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ, বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ও গড় প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় সম্পর্কে জানা, আমানতের প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য লাভ করা এবং এর আট বছরের পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগের ধারা বিশ্লেষণ মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।]

ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতি সম্পদের সুষমবন্টন, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক দক্ষতা, প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতাসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা সম্পাদন করে। এ অনন্য অর্থনৈতিক দর্শনের নান্দনিক বিকাশই ইসলামী ব্যাংকিং। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ কতিপয় খ্যাতিমান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এসজেআইবিএল)। বিনিয়োগ ব্যবস্থা ব্যাংকিং কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চায় তা বহুলাংশে নির্ভরশীল তার বিনিয়োগ নীতিমালার উপর। এসজেআইবিএল-এর

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১ "A Financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamaic Shariah and to the banning of receipt and payment of interest on any of its operation."cf. Huque, Dr. Ataul, *Reading in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh,1987, p.188

বিনিয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের কৃষি, গৃহায়ণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা। এ লক্ষে ব্যাংকটির গৃহিত জনপ্রিয় প্রকল্পগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সাধারণ দোকানদার, আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তি, ডাক্তার, মহিলা উদ্যোক্তা, বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এসজেআইবিএল পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় পল্লী শাখাগুলোর মাধ্যমে পল্লী এলাকায় কৃষি উৎপাদনে ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে আর্থিক সহায়তা করে আসছে। Small and Medium Enterprise কর্মসূচির আওতায় এ ব্যাংক বিনিয়োগ করে দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়ের নতুন ক্ষেত্র তৈরি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইসলামী ব্যাংক শরীআহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে থাকে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক সফলতা ও অগ্রগতি সাধারণ মানুষের কাছে যেমন এর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। অনুরূপভাবে এটি বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং ও সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি প্রচলিত ধারার ব্যাংক পরিচালকগণও ইসলামী ব্যাংকের সফলতায় ও অফুরন্ত সম্ভাবনাসহ এর কল্যাণধর্মী কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে তাদের প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোতেও ইসলামী ব্যাংকিং শাখা চালু করছেন। ইতোমধ্যে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ও দি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সুদমুক্ত শরীআহ্ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার তাত্ত্বিক অনুশীলন ও কর্মকৌশল বিশেষ করে বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী। ব্যাংকটি একদিকে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়ন করে দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে, অন্যদিকে শিল্প ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে জাতীয় অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ব্যাংকটির ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির অভূতপূর্ব সাফল্য জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গতই বর্তমান সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যাংকটির পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণ-এর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত।

প্রাথমিক উৎসসমূহের (Primary Source) মধ্যে রয়েছে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড/ডাটা, ইসলামী ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি, পত্র-পত্রিকা, ওয়েবসাইট, এসজেআইবিএল-এর জার্নালসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ এবং অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ।

প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সরাসরি সংগৃহীত। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। Ms Word ও Ms Excel বিশ্লেষণী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ ও চিত্রভিত্তিক করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পরিচয়

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির পঞ্চম ব্যাংক হিসেবে সুদমুক্ত ইসলামী শরীআহ্‌ভিত্তিক শাহজালাল ব্যাংক লিঃ এর আত্মপ্রকাশ।[২] আধুনিক ব্যাংকিং সেবা-সুবিধা সম্প্রসারণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ অর্জনে সহায়ক হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অঙ্গীকার নিয়ে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ২০০১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ব্যাংকটি ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা প্রণয়ন করে। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়।[৩] ২০০১ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ১০ মে ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রূপে ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে।[৪] একই সালের ১০ মে ব্যাংকটি ঢাকার ৫৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিলে তার প্রথম শাখা উদ্বোধন করে।[৫] উল্লেখ্য, হযরত শাহজালাল র.-এর নামানুসারে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয়েছে।[৬]

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০৫ মিলিয়ন বা ২০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।[৭] ২০০৫ সালের মার্চ শেষে অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ

---

২. মোহন, ইকবাল কবীর, *আধুনিক ব্যাংকিং*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৪৫-৪৫

৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ৪

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৬. http://www.shahjalalbank.com.bd/index.php

৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ৬; মোহন, ইকবাল কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২০০০ মিলিয়ন বা ২০০ কোটি এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বেড়ে ৪৬৭ মিলিয়ন বা ৪০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।[৮] বিগত ৫বছরের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ–[৯]

সারণী-১

মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং	আইটেম	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
১.	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	৪০০০	৪০০০	৬০০০
২.	পরিশোধিত মূলধন	৯৩৬	১৮৭২	২২৪৬	২৭৪০	৩৪২৫

এসজেআইবিএল প্রতিষ্ঠালগ্নে (২০০১ সালে) একটি শাখা (ঢাকার ৫৮ দিলকুশা শাখা) নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩।[১০] কর্মসংস্থান ও ব্যাংকের সম্প্রসারিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য এ ব্যাংক একাধিক জনশক্তি নিয়োগ করেছে এবং দিন দিন এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর মাসে মোট জনশক্তি ছিল ৮৪ জন। ২০০২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৫ জনে।[১১] ব্যাংকের বর্ধিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা, নতুন শাখাসমূহে জনশক্তি যোগান এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে মেধাবী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনশক্তির একটি পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো[১২] –

সারণী-২

শ্রেণী	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
কর্মকর্তা	৭৩	১৬১	১৯৮	২৩২	২৮৪	৩১২	৪২৮	৬৪৩	৯৫৫	১২৭৩
কর্মচারী	১১	৩৪	৪৫	৫১	৫৬	৬৫	১২৭	২৩৫	৩৪৪	৩৯৮
মোট জনশক্তি	৮৪	১৯৫	২৪৩	২৮৩	৩৪০	৩৭৭	৫৫৫	৮৭৮	১২৯৯	১৬৭১
মোট শাখা	২	৮	১০	১২	১৬	২১	২৬	৩৩	৫১	৬৩

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৪-২০০৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১৫৪

৯. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ১১

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১১. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ২৩

১২. *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০৩-০৪, ২০০৫-০৬, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, পৃ. ১৪৪, ১৬৫, ১৫৫, ১৫৭, ১৬৩; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ১১, ৬২

ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীআহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করার জন্য ও প্রয়োজনীয় শার'ঈ পরামর্শ দেয়ার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীআহ্ কাউন্সিল রয়েছে। এ শরীআহ্ কাউন্সিল কোম্পানির আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন এর ৩০ নং ধারা অনুযায়ী গঠিত।[১৩] শরীআহ্ কাউন্সিল এ ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের ইসলামী শরীআহ্র নীতি প্রতিফলন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শরীআহ্ কাউন্সিলকে সহযোগিতা করার জন্য ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি শরীআহ্ নিরীক্ষা ও প্রতিপালন দপ্তর কর্মরত রয়েছে। ব্যাংকের কার্যক্রম যথাযথভাবে শরীআহ্ নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শরীআহ্ কাউন্সিলের সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে অধিবেশনে মিলিত হয়ে শরীআহ্ সংশিষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরামর্শ প্রদান করেন।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা বিশ্লেষণ

- শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ এর আইটেম ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল–

বিনিয়োগ পদ্ধতি

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সাধারণত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে থাকে:

ক. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি
   ১. বায়' মুরাবাহা
   ২. বায়' মুআজ্জাল
   ৩. বায়' সালাম

খ. ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি
   ১. ইজারা
   ২. মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়: হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক

বায়'-মুরাবাহা বিনিয়োগ

পণ্যের মূল্য হিসেবে বৈধ বিক্রয় পদ্ধতির বিশেষ এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির নাম বায়'-মুরাবাহা। আরবি বায়' এবং রিবহুন শব্দ থেকে বায়'-মুরাবাহা পরিভাষাটি উদ্ভূত। বায়' অর্থ– ক্রয় ও বিক্রয় এবং রিবহুন অর্থ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মুনাফা। সহজ কথায় বায়'-মুরাবাহা হচ্ছে, সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মুনাফায় বিক্রয়। এটি চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয় পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংকিং

---

১৩. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, পৃ. ১৬

কারবারে মুরাবাহা পদ্ধতি এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি, যার অধীনে ব্যাংক তার গ্রাহকের অনুরোধে শরীআহ্ অনুমোদিত কোন পণ্য সামগ্রী তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে ব্যাংকের নামে ক্রয় করে ক্রয়মূল্যের সাথে সম্মত লাভ যোগ করে তা সেই গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে। গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নগদ বা ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে মাল নিতে বাধ্য থাকে।[১৪] মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বায়'-মুরাবাহা পদ্ধতি দুই প্রকার।

যথা–[১৫] (১) বায়'-মুরাবাহা বিন-নাক্দ ও (২) বায়'-মুরাবাহা বিল-আজাল। তবে লেনদনেকারী পক্ষের দিক থেকে বায়'-মুরাবাহা দু'প্রকারের। যথাঃ

(ক) সাধারণ বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা ও ক্রেতা এ দু'টি পক্ষ থাকে। সাধারণ মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থাৎ সাধারণ ব্যবসায়ী যে কোন পণ্য অগ্রিম ক্রয় চুক্তি ব্যতীত ক্রয় করে পণ্যের কেনা দামের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফায় বিক্রয় করার জন্য বাজার বা দোকানে প্রদর্শন করে।

(খ) অঙ্গীকারের সাথে সম্পৃক্ত বায়' মুরাবাহা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা, ক্রেতা ও ব্যাংক এ তিনটি পক্ষ থাকে। ব্যাংক এ ব্যাপারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মাধ্যম হিসেবে ব্যবসায়ীর ভূমিকার পালন করে। ক্রেতা মূলধনের সাথে কিছু লাভ প্রদানের শর্তে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ব্যাংকের নিকট আবেদন করলে সেই বিক্রয়কেই অঙ্গীকারের সাথে সম্পৃক্ত বায়'-মুরাবাহা পদ্ধতি বলে।

বায়' মুআজ্জাল বিনিয়োগ

বিক্রয় যখন বাকীতে হয় তখনই তা হয় বায়' মুয়াজ্জাল[১৬]। আরবি বায়' এবং আজল শব্দদ্বয় থেকে বায়'-মুআজ্জাল পরিভাষাটি উদ্ভূত। বায়' অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় এবং আজল অর্থ নির্ধারিত সময় বা বিলম্বে প্রদান করা। বায়' মুয়াজ্জাল' বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকীতে পণ্য বিক্রয় বুঝায়। ব্যাংক পণ্য

---

১৪. সম্পাদন পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৪৪-৪৫

১৫. তাহের, মোঃ আবু, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: চলক প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩০২

১৬. Fuad Al-Omar & Mohammed Abdel-Haq এর মতে, "Literally meaning a credit sale. Technically a financing technique adopted by Islamic banks. It is a contract in which the seller allows the buyer to pay the price of a commodity at a future date in a lump sum or in instalments. The price fixed for the commodity in such a transaction can be the same as the spot price or higher or lower than the spot price." cf. *Islamic Banking: Theory, Practice & Challenges*, Karachi: Oxford University Press, 1st printing, 1996, p. xi

ক্রয় করে তার ওপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।[১৭]

বায়' সালাম বিনিয়োগ

বায়' সালাম একটি অগ্রিম ক্রয় চুক্তি। সালাম অর্থ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা, অগ্রগামী হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া[১৮] ইত্যাদি। বায়' সালাম এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহের শর্তে ইসলামী ব্যাংক পণ্যের মূল্য আগাম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করতে পারে। কৃষি পণ্য ও কুটির শিল্পে এ বিনিয়োগ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র কৃষকদের প্রভূত উন্নতি সাধন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, আরবি অভিধানে বায়' সালামকে বায়' সালাফ[১৯] ও বায়' মুহাবিজও[২০] বলা হয়।

ইজারা (Ijara)

ইজারা অর্থ ভাড়া দেয়া[২১], মজুরি দেয়া, বেতন দেয়া ইত্যাদি। ইজারা হচ্ছে নির্ধারিত কোন জিনিস বা অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের বা কাজের জন্য ব্যবহার ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ইজারা এমন একটি চুক্তি যা কোন কিছুর বিনিময়ে কাউকে কোন জিনিসের লাভ বা উপকারের মালিকানা দেয়া। মূলত মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা তৈরি করে স্বত্ব ত্যাগ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের জন্য মালিকানা ও ব্যবহার ক্ষমতা হস্তান্তর করাকে ইজারা বলে। যেমন, ফ্লাট-বাড়ি, জায়গা-জমি, দোকান, বিভিন্ন মেশিন, যানবাহন তথা বাস, ট্রাক, রিক্সা, জাহাজ ইত্যাদি নির্ধারিত সময় বা নির্ধারিত কাজের জন্য নির্ধারিত মুনাফায় ভাড়া গ্রহণ করাকে ইজারা বলে। ইজারা সাধারণত দু'ধরনের লক্ষ্য করা যায়। যথা–

---

১৭. সম্পাদন পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৮. আল-জাযায়িরি, আব্দুর রহমান, *কিতাবুল ফিক্হ আলা মাজাহিবিল আরবা'*, বৈরুত: দারুল আল-ইলমিয়া, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২৭২

১৯. বা'লবাকী, ড. রুহী, *আল-মাওরিদ*, আরবি-ইংরেজি অভিধান, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪১

২০. সাবিক, আস-সায়্যিদ, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরুত: দারুল কিতাবুল আরাবী, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ১৫০

২১. লুইয়াস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাত*, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়া, ১৯৯২, পৃ. ৪

(ক) পরিচালন ইজারা পদ্ধতি : স্বল্প মেয়াদী (পাঁচ বছর অথবা তদপেক্ষা কম সময়ের জন্য) বাতিলযোগ্য ইজারাকে পরিচালন বা ব্যবহারিক ইজারা বলে। তাৎক্ষণিকভাবে সুবিধাজনক সেবা প্রদান করাই এই ধরনের ইজারা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বিধায় একে সেবা ইজারাও বলা হয়।ট্রাক, কম্পিউটার, হোটেল রুম, অফিস, যন্ত্রপাতি, পর্যটকের নিকট গাড়িভাড়া প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিচালন ইজারা ব্যবহৃত হয়।[২২]

(খ) আর্থিক ইজারা পদ্ধতি : দীর্ঘ মেয়াদী বাতিল অযোগ্য ইজারা চুক্তিকে আর্থিক ইজারা বা মূলধনী ইজারা বলে। এই ধরনের ইজারা চুক্তি সাধারণত জমি, দালান কোঠা, শিল্পস্থাপনা, গুদাম ঘর, খুচরা দোকান, বড় বড় যন্ত্রপাতি, বিমান ও জাহাজ ইত্যাদি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২৩]

ক্রমহ্রাসমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি
(Hire-Purchase under Shirkatul Meilk)

'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' (এইচপিএসএম) এর অর্থ হলো– 'মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়'। ইসলামী ব্যাংকিং এর পরিভাষায়– এটি এমন এক ধরনের চুক্তি বা কারবার পদ্ধতি যেখানে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ গ্রাহকের নির্দেশিত পণ্য বা জিনিস উভয়ের যৌথ সম অথবা অসম পুঁজি দিয়ে ক্রয় করে তা বিক্রয়ের শর্তে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট ভাড়া প্রদান করে এবং গ্রাহক কিস্তিতে অথবা নির্ধারিত হারে মূলধনের টাকা ও ভাড়া পরিশোধ করে এবং চুক্তি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক জিনিসটির সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করে।[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা– (১) যৌথ মালিকানায় ক্রয় (২) ভাড়া প্রদান / গ্রহণ এবং (৩) বিক্রয় এবং মালিকানা হস্তান্তর (অর্থাৎ ভাড়া পরিশোধ শেষে গ্রাহকের মালিক হওয়া)।

- সারণী-৩ এ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর এক নজরে পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ, বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ও গড় প্রবৃদ্ধির হারের আট বছরের খতিয়ান উপস্থাপন করা হলো–

---

২২. আল-জাযায়রি, আব্দুর রহমান, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৮৮; মিনা, অধ্যাপক এম. শাহজাহান, *ব্যবসায় অর্থায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা*, ঢাকাঃ দি এনজেল পাবলিকেশন্স, মে ১৯৯৭, পৃ. ৪৪৪

২৩. মিঞা, অধ্যাপক এম. শাহজাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪

২৪. রকীব, আবদুর ও মোহাম্মদ, শেখ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব * প্রয়োগ * পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমিন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৮৬

সারণী-৩

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর মোডভিত্তিক বিনিয়োগ (২০০১-২০০৮) মিলিয়ন টাকায়

মোড সমূহ	২০০১	২০০২	বৃদ্ধি হার %	২০০৩ বৃদ্ধি হার (%)	২০০৪ বৃদ্ধি হার (%)	২০০৫ বৃদ্ধি হার (%)	২০০৬ বৃদ্ধি হার (%)	২০০৭ বৃদ্ধি হার (%)	২০০৮ বৃদ্ধি হার (%)	গড় বৃদ্ধি হার
বায়' মুরাবাহা	১৭.২৪	২৮০.৭৪	১৫২৮.৪২	৭৩৬.১৫ (১৬২.২২)	১৬৬৫.৪৮ (১২৬.২৪)	৩০৮২.৯২ (৮৫.১১)	৪৬৮৭.৩৬ (৫০.০৪)	৫৮৪৪.৮১ (২৪.৬৯)	৭৩৫৩.৬১ (২৫.৮১)	২৮৬.০৮%
বায়' মুআজ্জাল	১০১.১৬	১৩৬৮.৮৯	১২৫৩.১৯	২৩৪৬.০৭ (৭১.৩৮)	৩৮৯১.৮৭ (৬৫.৮৯)	৫০৫৪.৩৪ (২৯.৮৭)	৬৪২৩.০৭ (২৭.০৮)	৮৯১৯ (৩৮.৮৬)	১৩৮৮৮.৬৮ (৫৫.৭২)	২২০.২৮%
এইচপিএসএম ইজারা	৯.৭৪	১২০.০৮	১১৩২.৮৫	৭৫২.১৩ (৫২৬.৩৬)	১০৮৫.৮ (৪৪.৩৬)	১৯৪৭.১২ (৭৯.৩৩)	৩০০৯.৪৬ (৫৪.৫৩)	৩৫৮১.৯২ (১৯.০২)	৫৪৬৩.৪৪ (৫২.৫৩)	২৭২.৭১%
পারচেজ এবং নেগোসিয়েশন	৬৫.১৩	৪০.৪১	-৩৭.৯৫	৩১৩.১২ (৬৭৪.৮৬)	৩৯৩.২১ (২৫.৫৮)	৩৭৯.১৮ (-৩.৫৭)	১৩০৮.৫৫ (২৪৫.১০)	১৫৮৮ (২১.৩৫)	৩৭২১.৭৬ (১৩৪.৩৭)	১৫১.৩৯%
বায়' সালাম	—	—	—	১২.০৫ (-)	১৮.১৮ (৫০.৮৭)	—	—	—	—	—
কারয	১৮.১২	৩৯.৬৯	১০৯.০৩	৭২.৪১ (৮২.৪৪)	৭৬.৫৬ (৫.৭৩)	১১০.৬৯ (৪৪.৫৮)	৫৯.২৭ (-৪৬.৪৫)	২৯.৬৫ (-৪৯.৯৭)	১৬৮.৩৩ (৪৬৭.৭২)	৮৭.৫৮%
অন্যান্য	৫.১৬	১৫০.১৬	২৮১০.০৮	৩৭.৩৯ (-৭৫.১০)	১৭.৫৮ (-৫২.৯৮)	১৬.০২ (-৮.৮৮)	২৮.০৮ (৭৫.২৮)	৬৫৩.২৩ (২২২৬.৩২)	২৩২২.৯৫ (২৫৫.৬১)	৭৪৭.১৯%
মোট	২১৬.৫৫	১৯৯৯.৯৭	৮২৩.১১	৪২৬৯.৩২ (৪১৮.৬৮)	৭১৪৮.৬৮ (৬৭.৪৪)	১০৫৯০.২৭ (৪৮.১৪)	১৫৫১৫.৭৯ (৪৬.৫১)	২০৬১৬.৬১ (৩২.৮৮)	৩২৯১৮.৭৭ (৫৯.৬৭)	২১৩.৭৮%

তথ্যসূত্র: শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর ২০০১-২০০৮ বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ ও প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

বি.দ্র. প্রথম বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক।

উপরিউক্ত সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, শাহজালাল ব্যাংক লিঃ-এর মোডভিত্তিক বিনিয়োগে 'বায়' মুরাবাহা' পদ্ধতিতে বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৮৬.০৮%। এ পদ্ধতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল ২০০২ সালে ১৫২৮.৪২% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০০৭ সালে ২৪.৬৯%। 'বায়' মুরাবাহা' এর পাশাপাশি অবস্থানে রয়েছে এইচ.পি.এস.এম। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োজিত টাকার গড় প্রবৃদ্ধির হার ২৭২.৭১%। এ পদ্ধতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল ২০০২ সালে ১১৩২.৮৫% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০০৭ সালে ১৯.০২%। মোডভিত্তিক বিনিয়োগে 'বায়' মুআজ্জাল' পদ্ধতিতে বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২২০.২৮%। এ পদ্ধতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল ২০০২ সালে ১২৫৩.১৯% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ছিল

২০০৬ সালে ২৭.০৮%। উপরিউক্ত বছরগুলোতে পারচেজ এবং নেগোসিয়েশন পদ্ধতিতে বিনিয়োগের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫১.৩৯%। এ পদ্ধতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল ২০০৩ সালে ৬৭৪.৮৬% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০০২ সালে (-৩৭.৯৫%)। শাহজালাল ব্যাংক লিঃ পর্যালোচনাধীন আট বছরই 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা' পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগ করেনি। এছাড়া এই ব্যাংক 'কার্‌য' (এমটিডিআর/ ক্যাশ এর বিপরীতে ঋণ) পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ করেছে তার গড় প্রবৃদ্ধির হার ৮৭.৫৮%। এ পদ্ধতিতে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল ২০০৮ সালে ৪৬৮.৭২% এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০০৭ সালে (-৪৯.৯৭%)। এছাড়াও এই ব্যাংক পর্যালোচনাধীন আট বছরের মধ্যে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে (মোট দুই বছর) 'বায়' সালাম' পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ করেছে তার গড় প্রবৃদ্ধির হার ৫০.৮৭%। এসজেআইবিএল-এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২০০১-২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১ নং স্তম্ভ চিত্রে প্রদর্শিত হলো–

স্তম্ভচিত্র–১
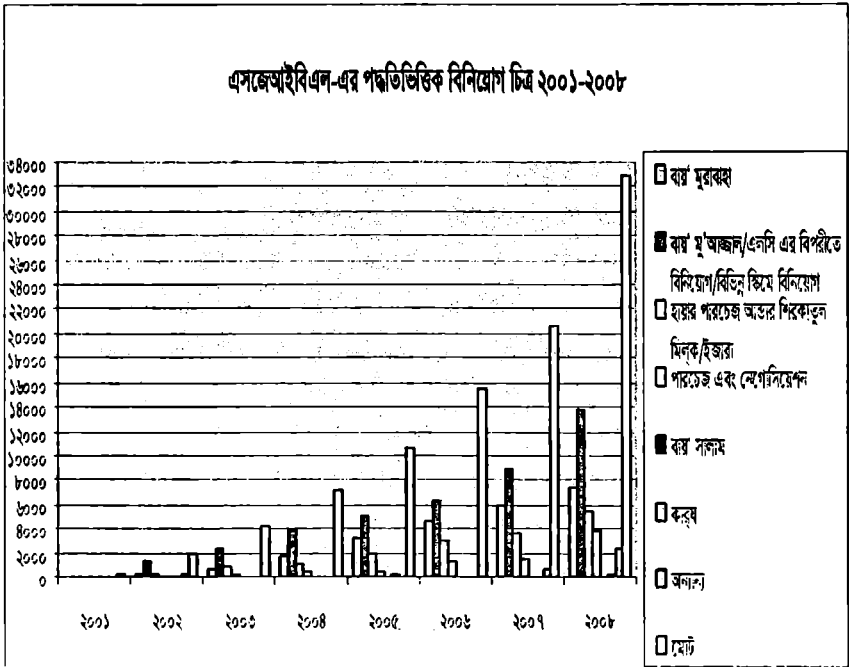
স্তম্ভ চিত্র-২

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর আমানত প্রবৃদ্ধির আট বছরের খতিয়ান
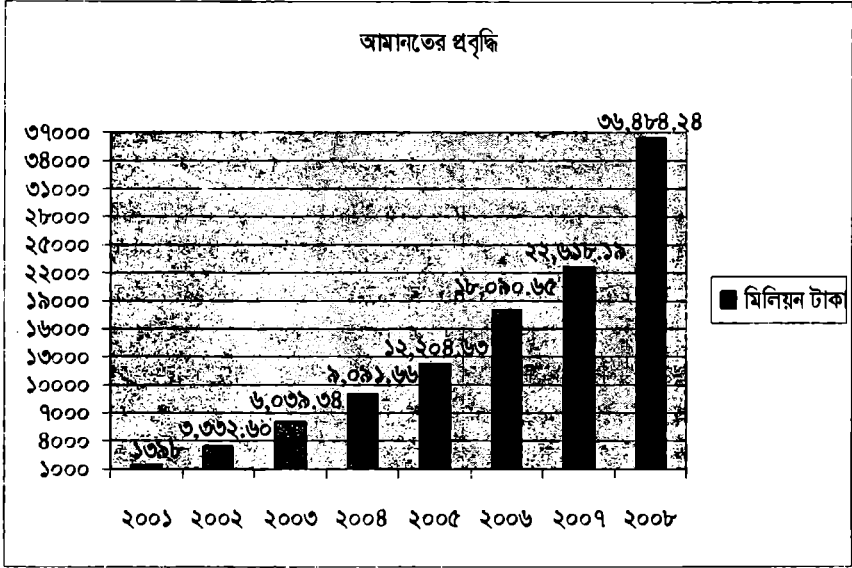
স্তম্ভ চিত্র-৩

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর পদ্ধতিওয়ারী বিনিয়োগের আট বছরের খতিয়ান
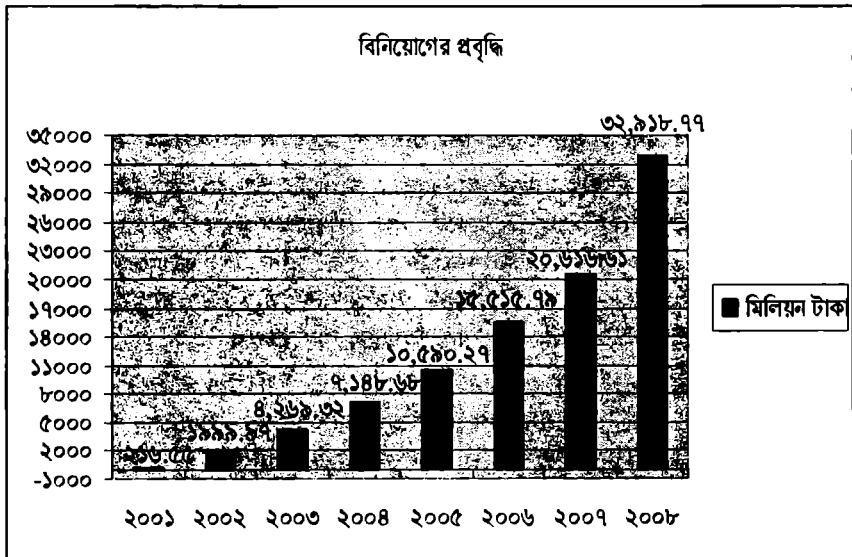
অনুসন্ধানের (Finding) ফলাফল

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ বেশ সাফল্যের সাথেই তার বিনিয়োগ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে। উপরন্তু তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাণিজ্যধর্মী পদ্ধতিসমূহই ব্যবহার করেছে সবচেয়ে বেশি। ব্যাংকটির উল্লিখিত আট বছরের পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগের সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ ব্যাংক মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে কোন বছরই বিনিয়োগ করেনি। প্রোক্ত আট বছরের মধ্যে ২০০৩ ও ২০০৪ সালে 'বায়' সালাম' পদ্ধতিতে বিনিয়োগ লক্ষ করা যায়। পর্যালোচনাধীন বছরগুলোতে এ ব্যাংক যে সমস্ত পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে 'বায়' মুআজ্জাল'। 'বায়' মুআজ্জাল' পদ্ধতিতে সকল বছরে এ ব্যাংক বিনিয়োগ করেছে সবচেয়ে বেশি যা মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। এর পরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ 'বায়' মুরাবাহা' পদ্ধতিতে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' পদ্ধতি। তবে 'বায়' মুরাবাহা' ও 'হায়ার পারচেজ এন্ড ইজারা' পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এমটিডিআর/ ক্যাশের বিপরীতে প্রতিবছর কার্‌য বা ঋণ প্রদান করলেও কল্যাণমূলক বিনিয়োগ কার্‌য হাসানাতে কোন বছরই বিনিয়োগ করেনি।

বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে অসমতার কারণ

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীআহ্সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করলেও সব পদ্ধতিগুলো সমভাবে প্রয়োগ করছে না। দেশের বিদ্যমান প্রচলিত আইন কাঠামোর দুর্বলতা, পূর্ণাঙ্গ শরীআহ্ আইনের অভাব ও এসজেআইবিএল-এর নিজস্ব দুর্বলতার কারণে বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো অনুসরণে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং পদ্ধতিগুলোর অসম প্রয়োগও লক্ষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণে অসমতার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হল–

১. প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক আবহে পরিচালিত হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক প্রধানত বায়' মুরাবাহা, বায়' মু'আজ্জাল, বায়' সালাম ও এইচপিএসএম পদ্ধতিতে এর বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এ পদ্ধতিগুলো সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ধারার প্লেজ ও হাইপোথিকেশনের জায়েয বিকল্প হিসেবে বিবেচিত।

২. ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ও ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতির সবগুলোতেই মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত এবং এ বিনিয়োগ পদ্ধতির অধিকাংশই ঝুঁকিমুক্ত ও ব্যবসায়ে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। এ জন্য ব্যাংকে লেনদেনের শুরুতেই মুনাফা নির্ধারণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ও ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করছে।

৩. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে কোনভাবেই সামঞ্জস্যশীল নয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং দীর্ঘদিন ইসলামী আর্থিক লেনদেন চালু না থাকার কারণে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি বিশেষ করে অংশীদারিত্ব পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়।
৪. অংশীদারি কারবারে ইসলামী জ্ঞান, পেশাগত ও কার্যকরী হিসাব ব্যবস্থাপনায় দক্ষ এবং ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাংকারের ঘাটতি রয়েছে।
৫. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কর ফাঁকি, অনৈতিক খরচ-ঘুষ ইত্যাদি কারণে মুনাফা গোপন করা ও লাভ-লোকসানের হিসাব সংরক্ষণে অস্বচ্ছতার দরুন অংশীদারিত্ব পদ্ধতি অনুসরণ ব্যাহত হচ্ছে।
৬. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে উপযোগী ইসলামী আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্টের অপ্রতুলতা।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণসহ কল্যাণমুখী আর্থ-সামাজিক সেবায় তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহ, পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মুনাফা অর্জন ইত্যাদিতে কাঙ্ক্ষিত মানে সফলতা অর্জন করছে। তবে এসজেআইবিএল পর্যালোচনাধীন সময়কালে বিনিয়োগের সর্বসম্মত ইসলামী পদ্ধতি মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে কোন বিনিয়োগ করেনি যা মোটেই কাঙ্খিত নয়। ব্যাংকটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ও ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করছে যার সবগুলোতেই মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত। শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত শর্তাবলী পূর্ণ অনুশীলন সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ও ভাড়ায় অংশগ্রহণ পদ্ধতি যথার্থই ইসলামিক এবং কল্যাণবহ। তবে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কিত সকল মৌলিক গ্রন্থেই কেবলমাত্র মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগকেই সুদের যথার্থ বিকল্প হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। কেননা বায়' মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল, এইচপিএসএম ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণদান প্রভৃতি পদ্ধতিতে অর্থায়নের বিপরীতে প্রাপ্য মুনাফা সুদের মতই পূর্বনির্ধারিত। এইসব অর্থায়ন পদ্ধতির কোন কোনটির ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ ঝুঁকি থাকলেও এই সকল ঝুঁকিই বীমাযোগ্য এবং সেগুলো কার্যত বীমা করা হচ্ছেও। ইসলামী ব্যাংক এসব পদ্ধতিতে অর্থায়নের সময় সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে বীমা কোম্পানির ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। সুতরাং পূর্ব নির্ধারিত মুনাফার অর্থায়ন পদ্ধতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল কোন অর্থব্যবস্থা সমতা, দক্ষতা, স্থিরতা ও প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় কোনক্রমেই সুদী ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। তাই সুদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত সুদের যথার্থ বিকল্প কেবলমাত্র

লাভ-লোকসান অংশীদারী পদ্ধতি ও মুনাফায় অংশগ্রহণ এবং লোকসান বহন পদ্ধতি অর্থাৎ মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতির ব্যাপক অনুসরণ বর্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন সামষ্টিক উন্নতি ও কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দুই একটি পদ্ধতিকে ক্রমাগত প্রাধান্য না দিয়ে মুশারাকা ও মুদারাবাসহ প্রচলিত সকল প্রকার পদ্ধতিকে যথাসম্ভব সমান গুরুত্ব দেয়া দরকার। তবেই বিনিয়োগ পদ্ধতি হয়ে উঠবে সহযোগিতাধর্মী, কর্মসংস্থানমূলক এবং দরিদ্রদের জন্য আয়বর্ধক ও যথার্থ উপযোগী। এছাড়াও প্রয়োজন–

১. ইসলামী শরীআহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সুদভিত্তিক ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এমন আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ব্যাংকার ও শরীআহ্ বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত ও নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত ভিত্তি নির্মাণ, মোটিভেশন প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করা।

৩. লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও পেশাদার ব্যাংকারদের মধ্যে চিন্তা, জ্ঞান ও গবেষণার সমন্বয় ঘটানো।

৪. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতির অধীনে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওকে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদী খাতে সম্প্রসারণ করা।

৫. আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়াকে পুনর্বিন্যাস করার মাধ্যমে দ্রুত ও সর্বাধিক সেবা প্রদান করা।

৬. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম, এর স্বতন্ত্র নীতি, পদ্ধতি, কর্মকৌশল এবং এর সফলতার নানা দিক গণমুখী করার জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়াকে কাজে লাগানো।

৭. দেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক ইসলামী আইন-ব্যবস্থা, ন্যূনতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদের শ্রেণীকরণের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

৮. ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকগণকে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যোগ নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ*

[সারসংক্ষেপ : জীবিকা ও এর উপকরণ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তিগত জীবিকার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ধাপ হল জীবিকার অন্বেষণ ও উপার্জন। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবীর করা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। জীবনোপকরণের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ব্যবসা-বাণিজ্য। এজন্য এ মাধ্যমটির সম্প্রসারণ করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য যেমন অত্যন্ত জরুরী তেমনি রাষ্ট্র বা সরকারের এটি অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। এর একটি হল সহীহ বা বৈধ এবং অপরটি ফাসিদ বা অবৈধ। প্রথমটির ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে আর দ্বিতীয়টির ব্যাপারে নিন্দা করেছে এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অবৈধ সুদ নিয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।]

ব্যবসা-বাণিজ্য

মানবসভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পৃথিবীর শুরু থেকেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে ব্যবসা-বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিকগণের মতে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কোন না কোন ভাবে চলে আসছে। কেননা সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ কখনই তার বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তখন হতেই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছে। মানুষের এ প্রচেষ্টা থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। মানুষের জীবনে অভাব অপরিসীম। অপরিসীম অভাব পূরণের জন্য মানুষ নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। অভাববোধ ও অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি। প্রাচীন bysing থেকেই আধুনিক business শব্দটি এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ- ব্যবসা হলেও এর দ্বারা যে কোন কাজ বা পেশায় নিয়োজিত বা ব্যস্ত থাকাকে বুঝায়। পরিভাষায়, পণ্য দ্রব্য উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যবসা বলা হয়।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, ঢাকা।

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলামে আয়-উপার্জনের যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে নিজের শারীরিক শ্রমলব্ধ আয় এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়কে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা দুনিয়াবী কাজ হলেও যখন একজন মুসলিম মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সততার সাথে জনকল্যাণ ও জনসেবার লক্ষে ব্যবসা করে তখন তা ইবাদতে পরিণত হয়। কোন জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতির উপর। এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই উন্নত রাষ্ট্রগুলো দ্বারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি ধর্মীয় কার্যকলাপ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। পশ্চিমারাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ইরাক ও আফগানিস্তান আক্রমণ এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অধুনা মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা জুড়ে যে গণজাগরণ শুরু হয়েছে সেখানেও এই একই কারণ বিদ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে এই রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এর রাষ্ট্রপ্রধানগণ পশ্চিমাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং তাদের ইশারায় একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, রাজতন্ত্র কায়েম করে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নাগরিকদের দাসে পরিণত করেছে। ফলে এই রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

যে জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই সে জাতি অবশ্যই আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। যে দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য বরকত থেকে বঞ্চিত বর্তমানে না হলেও ভবিষ্যতে সে জালিম সরকারগুলোর শোষণ ও লুটতরাজের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্যই ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের নির্দেশ দিয়েছে; তার ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের নির্দেশ

ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জনের নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে– "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[১] এ আয়াতে ফযল বা অনুগ্রহ অর্থ– জীবিকা ও সম্পদ। সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কর্মের প্রতি উৎসাহদানের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, ৬২: ১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের নির্দেশ

অবৈধ পন্থায় উপার্জন না করে বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন-"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[২] "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।"[৩] প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ উপরিউক্ত আয়াতে 'তোমরা যা অর্জন কর' এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে উপার্জন অর্থ- ব্যবসা-বাণিজ্য।[৪]

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণের নির্দেশ

কুরআন ও হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রিয্ক সন্ধানের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন- "তোমরা পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর।"[৫] তিনি অন্য স্থানে বলেছেন- "কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।"[৬] নবী করীম স. বলেছেন- "তোমরা পরিভ্রমণ কর, পরিণামে ধনী হয়ে যাও।"[৭]

সত্যবাদী ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদা

রসূলুল্লাহ স. মুসলিমদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- "সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ পরকালে নবীগণ, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের

---

২. আল-কুরআন, ৪:২৯
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

৩. আল-কুরআন, ২:২৬৭
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

৪. রহমান, মাওলানা হিফযুর, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনু: মাওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ১৯৫

৫. আল-কুরআন, ৬৭:১৫
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ-

৬. আল-কুরআন, ৭৩:২০
وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ

৭. আল-মুনযিরী, আবূ মুহাম্মদ যাকিউদ্দীন, *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, খ.২, অধ্যায় : আস-সাওম سافروا تستغنوا

পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।"[৮] তিনি অন্য এক হাদীসে বলেছেন– "সত্যবাদী ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৯] অপর এক হাদীসে রয়েছে– "সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে।"[১০]

রিয্কের বিশ ভাগের উনিশ ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে নিহিত

মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত রিযকের বিশ ভাগের উনিশ ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে রয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "রিয্কের বিশ ভাগের উনিশ ভাগই ব্যবসায়ীর জন্য নির্ধারিত।"[১১]

জমিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদনকারীকে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল আখ্যা দিয়ে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "আমি তোমাদেরকে ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনার অসিয়ত করছি। কেননা তাঁরা দিগন্তকে ঠাণ্ডা রাখে এবং তারাই পৃথিবীতে আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্তব্যক্তি।"[১২]

ব্যবসা-বাণিজ্য স্তম্ভ স্বরূপ

ব্যবসা-বাণিজ্য জাতীয় জীবনে এক বিরাট ভূমিকা রাখে যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকলে মানুষের জীবন কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য স্তম্ভ স্বরূপ। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকলে তোমরা মানুষের উপর দুর্বহ বোঝায় পরিণত হতে।"[১৩]

---

৮. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ মা জাআ ফিত-তুজ্জার......, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৭২

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصدقين والشهداء

৯. আল-মুত্তাকী, আলী ইবনে হিসামুদ্দীন, *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল*, হাদীস নং-৪১১৩

أول من يدخل الجنة التاجر الصدوق

১০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০৮৬

التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة

১১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২২৭

فإن الرزق عشرون بابا تسعةعشر منها للتاجر

১২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪১১২

اوصيكم بالتجار خيرا فإنهم برد الأفاق و أمناء الله فى الأرض

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩

لولا هذه البيوع لصرتم عالة على الناس

প্রাচুর্য ও কল্যাণ

ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে প্রাচুর্য ও কল্যাণ বিরাজ করে। যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তার জীবনে, বাড়িতে প্রাচুর্য ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন– "যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য করে তার বাড়িতে প্রাচুর্য ও কল্যাণ সৃষ্টি হয়।"[১৪]

সুদ

সুদ হচ্ছে অর্থনীতির সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল বিষয়। মিসর, গ্রীস, রোম এবং হিমালয়ান উপমহাদেশের মত প্রাচীন সভ্য দেশগুলোতে অনেক অনেক যুগ পূর্বে সুদ সর্ম্পকিত আইন-কানূন প্রণীত হয়। বেদ, তাওরাত, ইঞ্জিলের মত বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থগুলোতেও সুদ সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। এরিস্টোটল এবং প্লেটোর মত প্রাচীন দার্শনিকদের বই-পুস্তকেও সুদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫] সুদকে নিয়ে এ যুগেও চিন্তা-গবেষণার অন্ত নেই। জাহেলী যুগে এটাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মত বৈধ মনে করা হতো। কিন্তু মানবতার কল্যাণ, মুসলিম সমাজের নৈতিক উন্নতি এবং মুসলিমদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির স্থায়িত্বের জন্য ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো জীবন-যাপনের সব ক্ষেত্রে সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার, ধন-সম্পদ আয়-উপার্জনের একটি অবৈধ বা হারাম পথ, যাকে ইসলাম প্রকাশ্যরূপে ধন উপার্জনের নিন্দনীয় অবৈধ পন্থা আখ্যা দিয়েছে এবং তার অনিষ্টতার বর্ণনা দিয়ে এ পথ গ্রহণকারীর ইহ ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করেছে।

সুদের পরিচয়

সুদকে আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হয়। রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, স্ফীতি বা বাড়তি। কুরআন মাজীদেও এ অর্থে 'রিবা'র ব্যবহার দেখা যায়। যথা– "তুমি ভূমিকে দেখ শুস্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"[১৬] পারিভাষিক অর্থে-সম্পদে একটা বিশেষ ধরনের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে

---

১৪. *কানযুল উম্মাল*, উদ্ধৃত, মাওলানা হিফযুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫

১৫. ইউসুফুদ্দীন, ড. মুহাম্মদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু: আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : ২০০৫, খ. ২, পৃ.৩৫

১৬. আল-কুরআন, ২২:০৫

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ -

রিবা। প্রচলিত অর্থে 'রিবা' হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যা ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তারই বিনিময় হিসেবে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে আদায় করে থাকে। "রিবা হচ্ছে এমন বাড়তির নাম যা কোন মালের বিনিময় নয়।"[১৭] "মালের ওপর যে অতিরিক্ত দাবি করা হয় তার নামই 'রিবা'।"[১৮]

সুদ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কারণ এতে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র হয় এবং ধনীরা আরোও ধনী হয়। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে সুদের উপর ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। সুদের টাকা ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে দারিদ্র্য। মহানবী স.-এর আবির্ভাবকালীন আরবের কৃষক ও অন্যান্য নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর লোক ঋণের জালে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আল্লামা বায়দাভী লিখেছেন, তারা (ঋণদাতারা) একটি নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে সুদ নিত। অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় এবং অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকতো। আর এভাবে ঋণগ্রহীতার সমস্ত সম্পত্তি একটি সামান্য পরিমাণের ঋণের দরুন ধ্বংস হয়ে যেত।[১৯] ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ শুধুমাত্র মহাজনী কারবারের ক্ষেত্রেই নয় বরং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সমভাবে হারাম।

রসূলুল্লাহ্ স.-এর আবির্ভাবকালে আরবে বিভিন্ন ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে কিছু রীতি এমন ছিল যার দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। তবে কিছু রীতি-নীতি ছিল জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ তাআলা ধীরে ধীরে তাঁর বান্দাদেরকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেন। এতে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত মানবতার জন্য ক্ষতিকর রীতিনীতির বিলুপ্তি ঘটে, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানও ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। এ সত্য সামনে রেখে চিন্তা করলে অনায়াসে বোঝা যাবে, আল্লাহ্‌র পরবর্তী নির্দেশ তাঁর পূর্ববর্তী নির্দেশকে বাতিল করতে আসে না বরং পরিপূর্ণ করতেই আসে। সুদের

---

১৭. ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, তা. বি. খ.১, পৃ.১০৩

১৮. আর-রাযী, ইমাম, আল-ফাখর, *আত-তাফসীর আল-কাবীর*, বৈরূত : দারু ইহ্য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., পৃ.২৬০

১৯. আল-বায়দাভী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল*, আল-কাহেরা : দার আল- কুতুব আল-আরাবিয়া, তা. বি. খ. ১, পৃ.১৫৪

বেলায়ও এ নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। আরবে সুদখোরী ব্যবসা ছিল একটি সাধারণ পেশা। সুদখোর মহাজনরা দাবি করত, সুদ এক ধরনের লেনদেন ছাড়া কিছু নয়। "তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত।"[২০]

আরবের পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা সাধারণত সুদী ব্যবসা করতো। হিজাযের খায়বার নামক বাজারটি ইয়াহূদী পুঁজিপতিদেরই অধিকারে ছিল। 'রাফি' নামক ইয়াহূদীকে 'তাজেরে হিজায' বা হিজাযের বণিক আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এ পুঁজিপতি ইয়াহূদীরা মজবুত কেল্লা তৈরী করে তাতে বসবাস করতো এবং গরীব শ্রেণীর লোকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো। এ সুদ নিষিদ্ধ করতে গিয়ে কুরআনে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় যে, সুদ খাওয়াটা ইয়াহূদীদের কর্ম। তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করছে এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল– এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"[২১]

মহাজনী সুদ

আরব দেশের লোকেরা ঋণের মাধ্যমে উপার্জিত মুনাফাকে বৈধ মনে করতো। বর্তমানে এটাকেই মহাজনী সুদ বলা হয়। বর্তমান সময়ের ন্যায় আরবদের মধ্যে যে সকল লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলো হল–

১. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গরীব লোকদের ঋণ দেয়া হতো এবং টাকা প্রতি সুদ ধার্য করা হতো।

২. ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে সুদ ও মূল টাকা মিলিয়ে আসলে রূপান্তরিত করা হতো এবং পুরো টাকার উপর সুদ ধরা হতো। একেই বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ।

৩. অলংকার, অস্ত্র কিংবা এ জাতীয় জিনিস বন্ধক রেখে তার পরিবর্তে ঋণ দেয়া হতো। ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধকী জিনিসের উপর সুদ ধরা হতো এবং সুদ বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে বন্ধকী জিনিসটি আত্মসাৎ করে ফেলা হতো।[২২] ইসলামী ফিক্‌হর পরিভাষায় এটাকেই 'রিবা আন-নাসিয়াহ্' বলা হয়।

---

২০. আল-কুরআন, ২:২৭৫

قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ -

২১. আল-কুরআন, ৪:১৬১

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

২২. রহমান, মাওলানা হিফযুর, প্রাগুক্ত পৃ.২১৫

ইসলাম বিনাশ্রমে অর্জিত এ মুনাফাকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সর্বকালের জন্য সুদকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– "হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান হারে এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[২৩] এখানে দ্বিগুণ, চারগুণ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রেখে সুদের সাধারণ নিয়ম-নীতির বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি বরং এখানে শুধু বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেকালে আরবের মাটিতে যা কিছু বাস্তবে ঘটত এটা তারই আলোচনা মাত্র।

বর্তমান যুগেও পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে সুদখোর মহাজনদের পৈশাচিকতা, নির্মমতা, অসহায় বনী আদমকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার বহুমাত্রিক চিত্র দেখা যায়। গৃহকর্তার গৃহীত ঋণের জন্য তার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও ইয়াতীম সন্তানদের বাস্তুহারা হতে দেখা যায়। সামান্য ক'টি টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে তার সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের জন্য ঋণ গ্রহীতার বাড়ি-ঘর নিলাম হওয়ার ঘটনা অহরহ পত্রিকার পাতায় পরিদৃষ্ট হয়। আবার কখনও কখনও তার বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়সহ সব মালামাল ক্রোক হতে দেখা যায়। এমনও খবর পত্রিকান্তরে জানা গেছে যে, সামান্য ক'টি টাকার জন্য ঋণ গ্রহীতার মৃত্যুর পর তার শবদেহ সৎকার করতে দেয়া হয়নি যতক্ষণ না মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। গরীব ও সর্বহারা মানবতাকে নিয়ে এ হল সুদখোর মহাজনদের কুকীর্তির চিত্র, যা বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশে হর-হামেশাই দেখা ও শোনা যায়।

কুরআন মাজীদ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, মহাজনী সুদ ছাড়াও সাধারণ সুদী কারবারকেও নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[২৪] শরীয়তের দৃষ্টিতে 'রিবা'র কি অর্থ তা আমরা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। ফকীহদের মতে 'বা'ঈ' বা বেচাকেনার অর্থ হচ্ছে "স্বেচ্ছায় নিজের মালকে অন্যের মাল দ্বারা বিনিময় করা।"[২৫]

---

২৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৩০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

২৪. আল-কুরআন, ২:২৭৫

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

২৫. আবুল হাসান আলী, বুরহান উদ্দীন, *আল-হিদায়া*, করাচী : কালাম কোম্পানী, খ. ৩, পৃ. ১২৭

সুদ হারাম করার সাথে সাথে কুরআনে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত যা গ্রহণ করেছ তা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। সুদকে হারাম ঘোষণার পর ঋণগ্রহীতার নিকট যা পাবে তা মাফ করে দাও। মাফ না করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। রসূলুল্লাহ্ স. নবুওয়তের শেষ বর্ষে সুদ সম্পর্কিত কুরআনের এ শেষ নির্দেশটি সকলকে শুনিয়ে দেন। "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।"[২৬]

বাণিজ্যিক সুদ

মহাজনী সুদ ছাড়াও ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক লেনদেনেও সুদের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক লেনদেনে নিম্নের দুটি নীতি লংঘিত হলে তা সুদ হিসেবে পরিগণিত হবে। নীতি দুটি হল–

১. সমজাতীয় পণ্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে খাঁটি-অখাঁটি, সজ্জিত-অসজ্জিত, কম দামী-বেশী দামী, ভাল-খারাপ ইত্যাদি বিবেচনা না করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের পণ্য সমান ওজনের হতে হবে। কম-বেশী করা যাবে না। তাৎক্ষণিক বিনিময় করতে হবে। ধারে বা বাকীতে করা যাবে না। যেমন– সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ, কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস, মোনাক্কার বিনিময়ে মোনাক্কা প্রভৃতি সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ের সময় সমান সমান, হাতে হাতে লেনদেন করতে হবে। কম-বেশী করলে তা সুদ হয়ে যাবে।

২. ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সমজাতীয় না হলে, তাতে কম-বেশী করা যাবে। যেমন– সোনার বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে গম প্রভৃতি লেনদেনে কম-বেশী করা যাবে। তবে এ জাতীয় পণ্যের বেচাকেনাও নগদ করতে হবে। ধারে বা বাকীতে করা যাবে না।

---

২৬. আল-কুরআন, ২:২৭৮-৮০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ - وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

এ দুটি নীতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স. এর নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটিকে ফকীহগণ মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি 'উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন– 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবনের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণ এবং হাতে হাতে তথা তাৎক্ষণিক ও নগদ হতে হবে। আর পণ্য সমজাতীয় না হলে যেভাবে খুশী কম-বেশী করা যাবে। তবে বাকীতে করা যাবে না এবং সংগে সংগে লেনদেন করতে হবে।[২৭] ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এটাকেই 'রিবা আল-ফদল' বলে আখ্যায়িত করেন।

মুসলিম ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীসটিকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ হওয়া না হওয়া নির্ধারণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তাবলীর পরিপন্থী হলে তাঁরা তাকে সুদ হিসেবে অভিহিত করেন। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ হাদীসে বর্ণিত শর্তানুযায়ী হলে তাঁরা তাকে বৈধ মনে করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এ নীতিটিই পার্থক্য নির্ণয় করে। সাধারণ ব্যাংকিং-এ টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হয় বলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে সুদে পরিণত হয়, আর ইসলামী ব্যাংকিং-এ মালামালের বিনিময়ে টাকার লেনদেন কম-বেশী করা হলেও তাতে সুদ হয় না।

সুদী কারবারের সাথে জড়িত সবাই অপরাধী

সুদের অনিষ্টতা আর তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইসলাম এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন ব্যক্তি যে কোন রূপে অংশীদার হোক না কেন; চাই তার দলীল ও চুক্তিপত্র লেখক হোক কিংবা তার সাক্ষী হোক তাদের সকলের প্রতিই অভিশাপ দিয়ে থাকে। জাবির রা. বলেন– "রসূলুল্লাহ্ স. সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদী ব্যবসার লেখক এবং ঐ সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন– অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সবাই সমান।"[২৮]

---

২৭. মুসলিম, ইমাম, আস-*সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আস-সারফু ওয়া বাইয়িয যাহাবি বিল ওয়ারাকি নাকদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৩

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

২৮. মুসলিম, ইমাম, আস-*সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : লা'নু আকলির রিবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৫ لعن الله أكل الربا و موكله وشاهديه وكاتبه قال هم سواء

নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন

রসূলুল্লাহ্ স. বিদায় হজ্জে ঘোষণা করেছিলেন, সব রকমের সুদই অবৈধ, তবে মূল অর্থ তোমাদেরই, সেটা তোমাদের পাওয়াও উচিত যাতে তোমরা অত্যাচারী না হও এবং অত্যাচারিতও না হও। আল্লাহ্ তাআলা শেষবারের মত ঘোষণা করেছেন, সুদী ব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর আমি 'আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ ব্যবসার উপর সর্বপ্রথম এ নির্দেশ জারি করছি। ভাল করে জেনে নাও, প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের ভাই। সমস্ত মুসলিমই পরস্পর ভাই ভাই। নিজের ভাইয়ের জিনিস জোর করে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়, হ্যাঁ যদি সে ইচ্ছা করে কিছু দেয়। তোমরা নিজেদের উপর অবিচার কর না। হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার পয়গাম পুরোপুরি পৌছে দিয়েছি?"[২৯]

এ ভাষণ তথা মানবাধিকারের এ চার্টটি ঘোষিত হওয়ার পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতার'এ আয়াতটি নাযিল হয়: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[৩০]

উপরোক্ত ভাষণে রসূলুল্লাহ্ স. সুদকে কেবল নীতিগতভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং আপন চাচার সুদী কারবারের উপর এ নিষেধাজ্ঞা সর্বপ্রথম কার্যকরও করেছিলেন। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের অর্থ অসংখ্য লোকের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।[৩১] তিনি রীতিমত লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে সুদী কারবার পরিচালনা করতেন।

সুদখোরের পরিণাম

সুদখোর টাকার নেশায় বেসামাল হয়ে যায়। সে অসৎ চরিত্রের অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যায়। মানবতার আলোকশিখা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব, সমবেদনা, সহমর্মিতাকে সে অর্থহীন মনে করে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা ও অন্যদের সমূলে ধ্বংস করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে যায়। অভাবী ও অসহায়দের

---

২৯. ইবনে হিশাম, *আস-সীরাত আন-নববীয়াহ* , বৈরূত : ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯৮৫, খ.২, পৃ.১৪৬

৩০. আল-কুরআন, ৫ : ৩

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

৩১. আত-তাবারী, ইমাম, *তারীখ আর-রুসুল ওয়াল মূলুক*, ১৯৬৪, পৃ.১৭৫৩

দুরবস্থা সে দেখেও দেখে না, সহায়-সম্বলহীনের আর্তনাদ তার কানে প্রবেশ করে না। সে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এ জন্য কুরআন মাজীদ পরকালে সুদখোরের পরিণতি এভাবে চিত্রিত করেছে, "যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নিঅধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন । আল্লাহ্ কোন পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।"[৩২] ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী এটা হল শেষ সীমা যে সুদকে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সুদখোরকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ঘোষণা করা হয় , "মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।"[৩৩] অর্থাৎ, সুদখোর পার্থিব জীবনে যে সুখের সন্ধান লাভের জন্য সুদ খেয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাতে তার সুখ আসে না, বরং তার দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণে বেড়ে যায়। কারণ তার শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যায়, আরো অধিক সম্পদ লাভের আশায় সে পাগলের মত হয়ে যায়। সম্পদের আধিক্যের দরুন মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। সে এবং তার পরিবারের সদস্যরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নানা রকম অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এতে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন মানুষদেরকে কবর থেকে উঠাবেন তখন সুদখোর ছাড়া সকলেই দৌড়াতে থাকবে। সুদখোররা দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে,

---

৩২. আল-কুরআন, ২:২৭৫-৭৬

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا۟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا۟ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ - يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى الصَّدَقَٰتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ -

৩৩. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ اللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ -

যেমন মাতাল ব্যক্তি পড়ে যায়। কারণ তারা দুনিয়ায় যে সুদ খেয়েছে আল্লাহ্ তাআলা তা তাদের পেটে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ভারী করে দিবেন। ফলে তারা দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যাবে। অন্যান্য মানুষের ন্যায় দ্রুত হাঁটতে চাইলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। কাতাদাহ্ র. বলেছেন- "সুদখোর কিয়ামতের দিন পাগল হয়ে উঠবে। এটাই সুদখোরদের আলামত। হাশরের মাঠে লোকেরা তাদের চিনতে পারবে।"[৩৪] আবদুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- "কোন জনপদে যিনা ও সুদ ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ্ সে জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি দেন।"[৩৫]

সামুরাহ রা. রসূলুল্লাহ্ স.-এর স্বপ্ন বিষয়ক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন- "সুদখোরকে মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোহিত নদীতে ফেলে সাতরানোর শাস্তি দেয়া হবে যা হবে রক্তের মতো এবং পাথর গিলানো হবে, তা হল সেই হারাম মাল যা সে দুনিয়ায় জমা করেছে, তাকে আগুনের পাথর ভক্ষণ করানো হবে যেমনিভাবে সে দুনিয়ায় হারাম জমা করে ভক্ষণ করেছে।" ইমাম আহমদ র. আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন- "ইসরা বা মিরাজের রজনীতে আমাকে এমন একদল লোকের কাছে নেয়া হল যাদের পেট ঘরের ন্যায় বিরাট, যেগুলোর ভিতর থেকে সাপ বের হচ্ছে। আমি বললাম: হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন- এরা সুদখোর।"[৩৬]

আবূ হুরায়রা রা. রসূলুল্লাহ্ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন- "চারজনকে জান্নাতে না ঢুকানো এবং তার নি'আমত আস্বাদন না করানো আল্লাহর হক। এরা হল- মদখোর, সুদখোর, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, তবে যদি তারা তওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন।"[৩৭]

---

৩৪. আল-মানসূর, আহমাদ ইবনে আবদুল আযীয, *আদ-দুররুল মানছুর*, রিয়াদ : দারু ইব্নিল আছীর, ২০০১, পৃ.২৭৮

إن اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك علم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف

৩৫. প্রাগুক্ত إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها

৩৬. ইবনে কাছীর, ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, তা.বি., খ.১, পৃ.৩৭৬

أتيت ليلة أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجرى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا

৩৭. *আদ-দুররুল মানছুর*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৯ أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه إلا أن يتوبوا

বর্ণিত আছে, সুদখোররা সুদ খাওয়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে কিয়ামতের দিন তারা কুকুর ও শুকরের আকৃতিতে উঠবে। যেমনিভাবে শনিবার ওয়ালাদের আল্লাহ নিষিদ্ধ মাছ ধরার কৌশল অবলম্বনের কারণে চেহারা বিকৃত করেছিলেন। তারা মাছের জন্য শনিবারে গর্ত করে রাখত এবং সেদিন মাছ সেখানে পড়ত, পরে তারা রবিবারে সেগুলো শিকার করতো। তাদের এরূপ কৌশল অবলম্বনের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করেছিলেন।[৩৮] আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, সুদে রয়েছে সত্তরটি পাপ, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল কোন লোকের তার মাকে বিয়ে করার সমতুল্য (নাউযূবিল্লহ)।"[৩৯] আবূ বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– "সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী।"[৪০] অর্থাৎ পাপের দিক থেকে উভয়েই সমান।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা এক রকম হতে পারে না। নিম্নে তা তুলে ধরা হল–

১. ব্যবসায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মুনাফার সমান বিনিময় হয়। ক্রেতা পণ্যটির দ্বারা লাভবান হয়। আর ক্রেতার জন্য পণ্যটি জোগাড় করতে বিক্রেতা যে মেধা, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করেছে তার বিনিময় গ্রহণ করে। অপরদিকে সুদী লেনদেনের ক্ষেত্রে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদখোর নিশ্চিত লাভ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সুদ প্রদানকারী 'সময়' লাভ করে, যার দ্বারা লাভবান হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা যদি সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ঐ ঋণ নেয় তাহলে নিশ্চিতভাবে তা অলাভজনক এবং অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ নেয় তাহলে লাভ-ক্ষতি দুটোরই সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সুদের ভিত্তি হল একটি পক্ষের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ এবং অপরপক্ষের লোকসান অথবা অনিশ্চিত লাভের ওপর।

২. ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে মাত্র একবারই লাভ গ্রহণ করে। তা যত বেশীই হোক । কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে সুদখোর ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের

---

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. ইবনে মাজা, ইমাম আস-*সুনান, অধ্যায় : আত-তিজারাত*, *অনুচ্ছেদ আত-তাগলীয ফির-রিবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১৩

الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه

৪০. আদ-দুররুল মানছুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭৯

الزائد وللمستزيد فى النار

সাথে পাল্লা দিয়ে বর্ধিত হারে বার বার সুদ নিয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতা ঐ অর্থ থেকে সীমিত লাভ করলেও সুদখোর তার থেকে সীমাহীন লাভ করে। এমনকি ঋণদাতা তার স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু সুদখোরকে সমর্পণ করার পরও সুদখোরের দাবি শেষ হয় না।

৩. ব্যবসায়ে পণ্যের বিনিময় মূল্য পরিশোধ করার সাথে সাথে লেনদেন শেষ হয়ে যায়। ভাড়ার ক্ষেত্রে যে বস্তুটির জন্য ব্যবহারকারী ভাড়া দেয় তা অবিকৃত থেকে যায় এবং সে অবস্থায়ই তা মালিককে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুণর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে ব্যক্তি অর্থ, শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সুদখোর শুধু তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে কোন প্রকার শ্রম, মেধা ও সময় বিনিয়োগ না করে মুনাফার সিংহভাগের মালিক হয়ে যায়। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ-লোকসানের সমান অংশীদারিত্ব থাকলেও সুদখোর লাভ-লোকসানের পরোয়া না করে কেবল নির্ধারিত পরিমাণ লাভের দাবি করে।

এ সব কারণে ব্যবসা ও সুদের অর্থনৈতিক মর্যাদার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রচিত হয়। যার ফলে ব্যবসায় মানবিক তমদ্দুনের লালনকারী শক্তিতে পরিণত হয় আর সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়।

সুদ হারাম করার রহস্য

বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ সুদ হারাম করার যে কয়টি রহস্য বর্ণনা করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হল[৪১]–

ক. ধন-দৌলত, নৈতিকতা আর সাধারণ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে ইসলাম কিছু মৌলিক বিধান রচনা করেছে। ইসলাম বলে, ব্যক্তির হাতের সম্পদ হচ্ছে একটি আমানত বিশেষ। এ আমানত সে সমাজের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যয় করবে। জনমানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাকে পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে মানুষের ক্ষতি করার কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি। এ সুযোগ তাকে কখনও দেয়া হয়নি যে, সে মানুষের প্রয়োজন-মুহূর্তের

---

৪১. কুতুব, সাইয়্যেদ, *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু : মোঃ কারামত আলী নিজামী, ঢাকা : শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৩৯৪, পৃ.৩৪৫-৫৬

অপেক্ষায় থাকবে, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করবে অথবা তাদেরকে দেয় পরিমাণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী আদায় করবে। মানুষের প্রয়োজন বহু প্রকার হয়ে থাকে। কখনও খাদ্যের, কখনও চিকিৎসার, আবার কখনও জ্ঞান অর্জন বা উৎপন্ন দ্রব্যের। এ সকল প্রয়োজন হয়ত অপূর্ণই থেকে যাবে অথবা তা পূরণের জন্য তারা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবে। ধনিক শ্রেণী তাদের প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে অল্প দান করে তাদের থেকে অনেক বেশী পরিমাণে আদায় করবে। আর তা আদায় করতে গিয়ে,গরীব বেচারারা কেবল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেই জীবনটা অতিবাহিত করবে। ফলে অবস্থা গিয়ে এমন পর্যায়ে দাঁড়াবে যে, তাদের সমগ্র আয়-উৎপাদন সুদখোরদের পকেটে চলে যাবে অথবা বছরের পর বছর ধরে তাদের ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকবে। পুঁজিপতিরা তাদের মূলধন বহাল রেখে বিনাশ্রমে মুনাফা অর্জন করতেই থাকবে। আসলে এটা হচ্ছে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের এমন ঘর্ম ও রক্তের ধারা, যা তারা ভয়ংকর পাশবিকতার সাথে আস্তে আস্তে চুষতে থাকে।

খ. ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও মহত্ব ব্যাপক। শ্রমই মালিকানা ও মুনাফা লাভের মূল বস্তু। শ্রমই সম্পদ জন্ম দেয়। ইসলাম কখনও এটা বৈধ মনে করে না একজন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং সম্পদের মালিক হতে থাকবে অথবা ধনই ধনের জন্ম দিবে।

গ. ইসলাম ব্যক্তির নৈতিক পবিত্রতা, সামাজিক জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। আর কোন সমাজে সুদ চালু থাকলে সে সমাজে নৈতিকতা এবং সমাজের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা, সৌহার্দ সম্প্রীতি থাকা সম্ভব নয়। কেননা এ দুটি পারস্পরিক বিপরীত বস্তু, কোনক্রমেই তা একই সাথে কোন সমাজে বর্তমান থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি কাউকে এক টাকা ধার দিয়ে বিনিময়ে দু টাকা আদায় করে, সে কোনক্রমেই শত্রু ছাড়া বন্ধু হতে পারে না। এক টাকা গ্রহণকারীর অন্তর কখনই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অন্তরে স্থান পেত পারে না। শত্রু যেমন বন্ধুরূপে এসে থাকে সুদখোরও তেমনই।

ঘ. পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি ইসলামী সমাজের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম। আর সুদপ্রথা সম্পূর্ণরূপে এ নীতির পরিপন্থী। সুদ ইসলামের এ মৌলিক নীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। আর এ কারণেই ইসলাম তা নিষিদ্ধ করেছে।

ঙ. ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও বে-আইনি ঘোষণা করার আরেকটি রহস্য হচ্ছে, সুদ এমনি একটি কারবার যার দ্বারা পুঁজি অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বৃদ্ধি না কোন চেষ্টা-তদবীরের ফসল, না তা শ্রমলব্ধ আয়। সুদ হাত-পা গুটিয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণীকে সম্পদ বাড়ানোর এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়, যার ওপর তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ফলে এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অকর্মণ্যতা, দুর্বলতা, বেহুদা বিলাসিতা ও বিভিন্ন প্রকার দুষ্কর্মের ঘনঘটা দেখা দেয়। মেহনতী জনতা যারা সর্বদা সম্পদের মুখাপেক্ষী, দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে অপারগ অবস্থায় সুদের উপর ঋণ নিয়ে কাজ কর্ম সম্পাদন করে তাদের উপর ভর করেই এ বিলাসি শ্রেণীটি গড়ে ওঠে। এর ফলে দুটি বীভৎস সামাজিক ব্যাধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর একটি হল, অপরিমিত ও অস্বাভাবিক হারে পুঁজির বৃদ্ধি আর অপরটি মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক অসম বৈষম্য ও ব্যবধান তৈরী হওয়া যা কখনও শেষ হবার নয়। সুদখোররা সম্পদ উপার্জনের জন্য সুকৌশলে এমন এক জাল বিস্তার করে রাখে যে জালে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা নিজ ইচ্ছায় ঝাঁকেঝাঁকে পঙ্গপালের ন্যায় উড়ে এসে জড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের রক্ত পানি করা আয়-উপার্জন সব সুদখোরদের হাতে তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

চ. ইসলামী জীবন দর্শন অনুযায়ী সম্পদের সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহ্ তাআলার। মানুষ একটি শর্তাধীনে এর প্রতিনিধি। সম্পদ বিষয়ে মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। এটি ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। আর এ নীতির নির্ধারক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। আর সুদভিত্তিক অর্থনীতির মূল দর্শন হচ্ছে মানব জীবন আর আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এ জমিনের সার্বভৌম মালিক হচ্ছে মানুষ। আল্লাহ্র সাথে কৃত কোন অঙ্গীকার পূরণে তারা বাধ্য নয়। নীতি-নৈতিকতা, অপরের স্বার্থ রক্ষা, কোন কিছুই তাকে দেখতে হবে না। সে যেভাবে ইচ্ছা সম্পদ উপার্জন করবে। তার ধন অর্জনের পথে লাখো কোটি মানুষের ক্ষতি বা তাদের দুঃখ-দুর্দশায় তার কিছু যায় আসে না। সে নিষ্ঠুর, নির্দয় ও স্বাধীন। মোটকথা এখানে ইলাহী বিধানের কোন প্রকারই দখল থাকে না।

ছ. উপরন্তু সুদের অভ্যন্তরে যে ত্রুটিপূর্ণ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ধ্যান-ধারণা সক্রিয় রয়েছে তা হচ্ছে , কোন না কোন উপায়ে সম্পদ অর্জন করে নিজের অসৎ প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করা। এ কারণেই সুদখোর কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অপরের স্বার্থকে পদাঘাত করাসহ যে কোন উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে। যার ফলে এমন একটি ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তিগত,

সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক কথায় প্রত্যেকটি স্তরে গুটি কয়েক সুদখোরের স্বার্থের খাতিরে মানবতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানব জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে কতিপয় হীন চরিত্রের লোকের হাতের মুঠোয় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এরা মানবতার প্রতি সামান্যতম দায়িত্ব পালন করে না। উপরন্তু এরা ধর্মীয়, নৈতিক এবং ন্যায়-নীতির বিধানের প্রতি বিদ্রূপ করে। নিজেদের অবাঞ্ছিত লোভ-লালসা এবং অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে তারা কোথাও থেমে যায় না। তারা মানুষের মধ্যে চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপের জাল ছড়িয়ে দেয়, ফলে মানুষ আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। তারা নিজেদের হীন স্বার্থ মাফিক বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় বা বাজারে সংকট সৃষ্টি হয়। তাদের প্রভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে যেসব বিলিয়নীয়ার বিশ্ব সম্পদের চাবিকাঠি হস্তগত করেছে তাদের স্বার্থই রক্ষিত হয়।

জ. সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে যদি নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়েও বিচার করা হয়, তবে তা সমাজের জন্য একটি ক্ষতিকারক নীতি বলে অবশ্যই প্রমাণিত হবে। এ অর্থনীতির অনিষ্টতা এতদূর বেড়ে গেছে যে, এর ছায়াতলে লালিত-পালিত পাশ্চাত্যের সকল প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরাও তার সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, যাদের শিক্ষা-দীক্ষা সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেই হয়েছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতির উপর যারা শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমালোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী জার্মানীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাখত। তিনি জার্মানীর Rich Bark-এর গভর্নর ছিলেন। ১৯৫৩ সনে দামেস্কে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলত নির্দিষ্ট কয়েকটি সুদখোরের হাতে চলে আসতে বাধ্য। এর কারণ হচ্ছে, সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা সর্বদাই লাভবান হয়ে থাকে। আর গ্রহীতা হয়ে থাকে কখনও লাভবান আবার কখনও ক্ষতির সম্মুখীন। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যারা সর্বদা লাভবান হয়ে থাকে, পরিশেষে সমস্ত সম্পদ তাদের হাতেই চলে আসতে বাধ্য। এটা বীজগণিতের হিসাব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।" তিনি বলেছিলেন, বাস্তব জগতে আজ তাই ঘটছে। কেননা বর্তমানে দুনিয়ার অধিকাংশ সম্পদের আসল মালিক হচ্ছে কয়েক হাজার ব্যক্তি। অবশিষ্ট মালিকগণ এবং শিল্পপতিরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেই কারবার চালিয়ে থাকে। আর তাদের শ্রমিক মজুরসহ অন্যান্য লোকেরা সেইসব বিত্তবানদের বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবেই থেকে যায়, যাদের পরিশ্রমলব্ধ আয় কেবলমাত্র এ কয়েকহাজার ব্যক্তিই পেয়ে থাকে।

ঝ. সুদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার কারণে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে অর্থলগ্নীকারী পুঁজি মালিকদের সর্বদাই একপ্রকার টানা-হেঁচড়া ও এবং হার-জিতের লড়াই চলতে থাকে। সুদখোরেরা পুঁজি আটকে রেখে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট এর চাহিদা এবং সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। তখন শিল্পপতি ও ব্যসায়ীরা মনে করে, এত অধিক হারে সুদ দিয়ে টাকা এনে লাভ করা সম্ভব নয়। এ সময় উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা মন্দাভাব দেখা দেয়। মালিকরা উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। হাজার হাজার লাখো লাখো শ্রমিক বেকার সমস্যায় পড়ে এবং সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। এমনিভাবে জগতের বুকে দ্রব্যমূল্যের বাজার মন্দা হওয়া এবং চাঙ্গা হওয়া সুদখোররা নিয়ন্ত্রণ করে আর সাধারণ জনতা নীরবে এ জুলুম সহ্য করে যায়।

ঞ. দেশের সকল মানুষ সুদ গ্রহণ করুক বা না করুক, অর্থলগ্নীকারী পুঁজি মালিকদের পরোক্ষভাবে সবাইকেই সুদখোরদের সুদ দিতে হয়। কেননা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা যে মূলধন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করে থাকে তার সুদ তারা ক্রেতা বা ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। তারা বিক্রিত দ্রব্যের মূল্যের সাথে সুদ যোগ করে মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে সুদের বোঝা আল্লাহ্র সমস্ত বান্দাহদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সমাজের অন্যান্য কাজ করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তার সুদও রাষ্ট্রের নাগরিকদেরই আদায় করতে হয়। উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে ইসলাম সুদকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে মানবতাকে এর সামগ্রিক কুফল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।

মূলত, সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রুখে না দিলে, এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠন করতে না পারলে, প্রচার-প্রসার না ঘটালে, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম না করলে অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত মুসলমান ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সুদের সাথে জড়িয়ে পড়বে। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বাধ্য হয়ে সুদের উচ্ছিষ্ট, ছিটা-ফোটা গ্রহণ করতে হবে। কেউই তা থেকে রেহাই পাবে না। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত মানুষ সুদ খাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হল সকল মানুষ? তিনি স. বললেন– তাদের মধ্যে যে সুদ খাবে না তাকেও সুদের ধুলা-বালি পেয়ে বসবে।"[৪২]

---

৪২. ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৮

উপসংহার : বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে সামাজিক ব্যবসা বা সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর নামে যেভাবে সুদী লেনদেন ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য সবাইকে অবিরাম চেষ্টা- তদবীর করতে হবে। ইসলামপ্রিয় বাংলাদেশী দরিদ্র জনসাধারণকে সুদের ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝাতে হবে। পরকালে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই তারা সুদী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামে গজিয়ে উঠা শত শত দেশী-বিদেশী চক্রবৃদ্ধি হারে সুদখোর এনজিওদের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। অন্যথায় আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জাহানেই সর্বস্বান্ত হতে হবে। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় অজ্ঞতার কারণে অথবা স্বেচ্ছায়- ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সুদী কারবার, সুদী প্রতিষ্ঠান, সুদী ব্যাংক-বীমা, লিজিং প্রতিষ্ঠান, সুদী হাউজিং লোন, শেয়ার ব্যবসা ইত্যাদির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন তাদেরকেও ভোগ-বিলাসে ডুবে যাওয়ার বাসনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং ইসলামী অর্থনীতি ও সুদের স্বরূপ বুঝাতে হবে। তা না হলে সুদ যেভাবে মহামারীর আকারে আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে তার করাল গ্রাস ও বিষাক্ত থাবা থেকে আমরা কেউই রেহাই পাব না।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

শিশু অপরাধ : বিচারব্যবস্থায় প্রবেশন আইনের উপযোগিতা

ড. নাহিদ ফেরদৌসী *

[সারসংক্ষেপ : বর্তমানে অপরাধ প্রবণতার সাথে যুক্ত হয়েছে শিশু-কিশোরদের একটি বিরাট অংশ। বাংলাদেশ এ অবস্থা থেকে ভিন্ন নয়। বাংলাদেশের শিশুরা নানা কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বড়রাও নিজেদের স্বার্থে এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।[১] সাম্প্রতিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে শিশু-কিশোরদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিশু হওয়ার কারণে এদের বিচার কাজটা বেশ সংবেদনশীল। পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে অপরাধের সংস্পর্শে আসা এসব শিশুকে কখনই এককভাবে দায়ী করা যায় না। কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে এদেরকে পৃথক সত্তা হিসেবে আলাদা বিচার, শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ব্যবস্থা এবং সমাজে পুণর্বাসন নিশ্চিত করার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। ফলে কারাগারগুলোতে শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব শিশুর প্রবেশনে মুক্তির বিষয়ে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ এর যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে 'প্রবেশন কার্যক্রম' পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শিশুর অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এভাবে অপরাধ জগত থেকে বের করে শিশুকে সুনাগরিকে পরিণত করা মানে একজন অপরাধীর সংখ্যা কমানো। উন্নত বিশ্বে প্রবেশন পদ্ধতি অপরাধ সংশোধনের একটি কার্যকরী মাধ্যম হলেও আমাদের দেশে 'প্রবেশন' বিষয়টি সম্পর্কে অনেকেই পরিচিত নন। প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আইনটি ১৯৬৪ সালে সংশোধিত হলেও প্রত্যাশানুযায়ী আমাদের দেশের প্রবেশন কার্যক্রম কোনো রকম নজির সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি বিভিন্ন সময়ে প্রবেশনে মুক্তি দিয়ে সমাজে পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যানও জানা যায় না। আমাদের দেশে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আইনটি

---

* সহকারী অধ্যাপক (আইন), এস এস এইচ এল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. ভূঁইয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচারব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম*, ঢাকাঃ সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, পৃ. ২

প্রচলন থাকলেও প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনার কোনো নীতিমালা তৈরী হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধটিতে প্রবেশন আইনের প্রায়োগিক পরিস্থিতি ও অপরাধে জড়িত শিশু-কিশোরদের সংশোধনের ক্ষেত্রে আইনটির উপযোগিতা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।]

প্রবেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব

প্রবেশন এক প্রকার আইনসম্মত সংশোধন ব্যবস্থা যা অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করাকে বোঝায়।[২] এ ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমাজের পরিমণ্ডলে রেখে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণত সেসব শিশুর জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়, যাদের জন্য তত্ত্বাবধান প্রয়োজন এবং যাদেরকে শাস্তি না দিয়ে মানসিক উন্নয়ন, সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য না করে বরং অপরাধ বিস্তারে সহায়তা করে। অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রবেশন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

এছাড়া ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালায় দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রীক বা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল লক্ষ শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।[৪] বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪-এর মূলনীতিও যেকোন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর জন্য শাস্তি নয় বরং সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা।

---

২. V.V, Devasia & Leelamma Devasia, *Criminology Victimology and Corrections*, New Delhi: Ashish Publishing House, 1992, p. 45

৩. Sarker, Abul Hakim, "Separate Treatment of Juvenile Offender in India and Bangladesh: Some Background Information", *The Journal of Social Development*, Institute of Social Welfare and Research, University of Dhaka, Vol. 4, Number 1, June, 1989, p. 32

৪. The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (JDLs); The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) and the UN Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (Vienna Guidelines)

প্রবেশন আইন প্রণয়ন

১৯৬০ সালে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০[৫] নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে জেলখানায় রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দণ্ডাদেশ দেয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিু ১ সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেয়া হয়।[৬] প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশু উভয় অপরাধীদের প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে আছে। এ প্রবেশন অর্ডিন্যান্সের পর ১৯৭৪ সালে দেশে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণীত হয় যেখানে এ প্রবেশন ব্যবস্থা কার্যকরি করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৭]

বাংলাদেশে প্রবেশন কার্যক্রম প্রচলন

১৯৬০ সালের প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও লঘু অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে কারাগারে রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য প্রথম ও লঘু অপরাধে সংবেদনশীল প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদেরও প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে রয়েছে। তবে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থার বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

কিন্তু পাকিস্তান আমলে প্রণীত প্রবেশন আইনটি যেমন পুরোনো তেমনি যথাযথ বাস্তবায়ন নেই।[৮]

শিশু আইনটি কার্যকর করার জন্য ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রবর্তন করা হলেও এ পর্যন্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করার কোনো ধরনের নীতিমালা নেই।

প্রবেশন অফিসারের আইনগত দায়িত্ব

বাংলাদেশে শিশুর বিচারব্যবস্থায় মূল আইনসমূহ যথা-শিশু আইনের ১৯৭৪ এর ৩১ ধারায়, শিশুবিধি ১৯৭৬ এর ২১ ধারায় এবং প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত)-এর ১৩ ধারায় 'প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

---

৫. প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (অধ্যাদেশ নং XLV)

৬. Khan, Borhan Uddin and Muhammad Mahbubur Rahman, *Protection of Children in Conflict with the Law in Bangladesh*, (Dhaka: Save the Children, UK, 2008), p.15

৭. ভূইয়া, মোঃ নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশে কিশোরদের বিচারব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮. আলম, মোহাম্মদ সাইফুল, "প্রবেশন নির্দেশিকা", ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৮, পৃ. ৪

শিশু আইন : ১৯৭৪

শিশু আইনের অধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব শিশু অপরাধীর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও সমাজে তাকে পুনর্বাসন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আইন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর গ্রেফতারকৃত শিশুর সমস্ত দায়দায়িত্ব প্রবেশন কর্মকর্তাদের।

শিশু আইনের ৩১ ধারায় বলা হয়েছে, সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। প্রবেশন অফিসার স্থানীয় কিশোর আদালত বা যেখানে এরূপ আদালত নেই সেখানে দায়রা আদালতের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় এ আইনের অধীন তদীয় কর্তব্য সম্পাদন করবে।

শিশু আইনের ৫২ ধারা অনুয়ায়ী পুলিশ কোনো শিশুকে গ্রেফতারের পরপরই তা প্রবেশন কর্মকর্তাকে জানাবে। প্রবেশন কর্মকর্তা তখন পূর্ববর্তী সব ঘটনা ও পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করবে, যা আদালতকে তার নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে পুলিশ অফিসার প্রবেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার নজির দেখা যায় না। ফলে এ বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কাজ হয় না।

শিশু বিধি : ১৯৭৬

শিশু বিধি ১৯৭৬ এর ২১ ধারায় প্রবেশন অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– প্রবেশন অফিসার শিশুর সাথে নিয়মিত সাক্ষাত করবেন এবং তার বাড়ি, স্কুলের অবস্থা, আচরণ, জীবন পদ্ধতি, চরিত্র, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং শিশুকে তার প্রবেশনের অবস্থা ব্যাখ্যা করবেন। নিয়মিত আদালতে হাজির এবং প্রতিবেদন দাখিল করবেন। শিশুর সংশোধন ও পুনর্বাসনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। পরিচালক ও আদালত কর্তৃক বিভিন্ন সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬৪ সালে সংশোধিত)

প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ এর ১২ ধারায় প্রবেশন অফিসারের নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত হবেন বলে আইনে এবং প্রবেশন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন। এ আইনের ১৩ ধারায় প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে। প্রবেশন অফিসার অপরাধীর আচরণ সম্পর্কে পরিচালককে রিপোর্ট দিবেন।

প্রবেশন আইনের বাস্তব পরিস্থিতি

আইনের একটি দিক শাসন আর অপরটি প্রতিপালন। স্বাভাবিকভাবে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের চেয়ে প্রতিপালনের দিকটা বেশি জোর দেয়া

হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শিশু আইন ও প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ দ্বারা শিশু-কিশোরদের বিচার না করে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত শিশু-কিশোরকে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার আওতায় বিচার করে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে।[৯]

১৯৬০ সালের প্রবেশন আইন অনুসারে দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট আদালত অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ, জেলার দায়রা আদালত, জুডিসিয়াল ম্যাজিসস্ট্রেট এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ম্যাজিসস্ট্রেট প্রথম ও লঘু অপরাধে জড়িত শিশু, কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ১ বছর ও সর্বোচ্চ ৩ বছরের জন্য প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন। তবে প্রবেশন দেয়ার এই ক্ষমতা শুধু বিচারকারী আদালত নির্ধারণ করে থাকেন।[১০] কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ আদালতে প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট মামলায় বিবেচনা করা হয় না।

প্রবেশন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক রূপ হচ্ছে আদালত কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের অধীনে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজে স্থান দেয়া ও তত্ত্বাবধান করা। যে শিশু প্রবেশনের অধীনে থাকে তাদেরকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। শিশু এসব শর্ত ও নিয়ম মানতে ব্যর্থ হলে তাদের উপর থেকে প্রবেশন নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়।

এভাবে আদালত শিশু আইনের অধীনে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর অনুর্ধ্ব তিন বছরের জন্য ভালো হবার শর্তে প্রবেশনের অধীনে ছেড়ে দিতে পারে। আদালত যদি প্রবেশন অফিসারের কাছ থেকে এমন প্রতিবেদন পায় যে, উক্ত শিশু প্রবেশনাধীন সময়ে ভাল আচরণ করেনি, তাহলে বাকি সময়ের জন্য তাকে কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে আটকাদেশ দিতে পারে।

ব্যতিক্রম হলো, প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আদালতকে শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের প্রবেশনের ক্ষমতা দিলেও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে অন্যান্য আরো কিছু অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তবে প্রবেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুর কারাদণ্ডের একটি বিকল্প হিসেবে প্রবেশনের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও বিচারব্যবস্থায় এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না।

---

৯. Hoque, M Enamul *et al., Under-Aged Prison Inmates in Bangladesh: A Sample Situation of Youthful Offenders in Greater Dhaka,* Dhaka: Action Aid Bangladesh and Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association, 2008, P.18

১০. *প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ*, ১৯৬০, ধারা ৩

শিশু আইন সরকারকে প্রতিটি জেলায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে এবং যেখানে এ ধরনের একজন ব্যক্তি নিয়োজিত আছে সেখানে ঐ জেলার আদালত কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট কেসের প্রয়োজনের সময় অন্য আরেকজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রবেশন কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কিশোর আদালতের অধীনে থাকবে অথবা যদি কিশোর আদালত না থাকে তাহলে ফৌজদারি আদালতের অধীনে থাকবে।

আইন অনুযায়ী, পুলিশ অফিসারের সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর সমস্ত দায়দায়িত্ব প্রবেশন অফিসারের। প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব শিশুর গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার শাস্তি ও সমাজে পুনর্বাসন ও একত্রীকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। সে কারণে শিশুর বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবেশন অফিসারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।[১১]

এ দায়িত্বটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সম্পাদন করতে হয়। তাই এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হলেও শিশুর বিচারব্যবস্থার কোনো কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

যদিও ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোট বিভাগ বন্দি শিশুদের মুক্তি দেয়ার জন্য সুয়োমটো রুল জারি করে।[১২] এতে শিশুর কারাগারে আটক বা অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তাদের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে দেশের বিভিন্ন কারাগারে কারাবন্দি শিশুর সংখ্যা অনেকটা কমে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

অতএব, দেশে প্রচলিত কিশোর আদালত ও ফৌজদারি আদালত, কোনো ব্যবস্থাতেই শিশু সুরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। শিশুর বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর প্রতি সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব নিয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশে বিচার করা প্রয়োজন।

---

১১. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৩১-০৮-২০০৯

১২. *Suo Moto* Order No.248, 2003; 11 BLT 2003 HCD 281

প্রবেশন আইন ব্যবহার না হওয়ার কারণ

১. আইন সম্পর্কে অসচেতনতা

বাংলাদেশে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের কোনো একক শিশু বিচারব্যবস্থা নেই। বাস্তবে শিশু অধিকার ও শিশু বিষয়ক আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবগত না থাকায় তারা শিশু আইনের প্রয়োগ করতেও উৎসাহ বোধ করে না। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় বিচারব্যবস্থা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারক ও সংশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবেশন আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন না থাকার কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কাজ হয় না।

২. শিশু-কিশোর অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী ব্যবস্থা অনুসরণ

শিশু আইনে শিশু অপরাধীর বিচার্য বিষয় অবহেলা ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ হয়। শিশু আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত আছে, আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

(ক) শিশুর চরিত্র ও বয়স;
(খ) শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ;
(গ) প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট এবং
(ঘ) শিশুটির স্বার্থে যে সকল বিষয় বিবেচনা করবে বলে আদালত মনে করে সে সকল বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে আদালত তা বিবেচনায় না এনে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ শুধু পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।[১৩] বস্তুত কোন শিশু বা কিশোর সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রবেশন অফিসারের রির্পোটের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

৩. অপর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার

আমাদের দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার নেই। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল প্রবেশন অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া আছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছে। বাকী ৪২টি জেলার উপজেলা

---

১৩. Sumaiya Khair, "Juvenile Justice Administration and Correctional Services in Bangladesh: A Critical Review", *Journal of the Faculty of law*, The Dhaka University Studies Part-F, Vol. 16 no. 2005, p. 12

সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রবেশন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমন্বয়ের অভাব এবং স্বল্প সংখ্যক প্রবেশন অফিসার থাকায় প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

করণীয়

শিশু আইনের সাথে প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে শিশুদের অপরাধ মুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়া সহজ হয়।

- শিশু আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ যেমন ভবঘুরে আইন, ১৯৪৩ ইত্যাদি বাতিল করতে হবে এবং শিশু-কিশোর বিচারব্যবস্থায় শিশু আইন ও প্রবেশন আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- শিশু-কিশোরদেরকে আইনে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি থানায় ও আদালতে একজন করে স্থায়ী প্রবেশন অফিসার নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।
- দেশে প্রতিটি বিভাগে কিশোর আদালত স্থাপন করতে হবে এবং আদালতে প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি লাভের পর শিশু-কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন।
- কিশোর অপরাধের বিচারব্যবস্থার লক্ষ হতে হবে যে শিশুরা আইন লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত তাদের প্রতি এমন আচরণ নিশ্চিত করা, যাতে সেই শিশু-কিশোরটির সংশোধন ঘটে, পরিবারের সাথে সে পুনরায় একত্রিত হতে পারে এবং সমাজে সে পুনর্বাসিত হতে পারে।

উপসংহার : শিশু ও কিশোরদের অপরাধ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবেশন কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও যুগোপযোগী করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক জেলায় সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত উপযুক্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং প্রবেশন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রবেশন আইন সর্ম্পকে সচেতন এবং প্রয়োগ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আটকাবস্থাকে সর্বশেষ পন্থা এবং যথাসম্ভব স্বল্পতম মেয়াদের জন্য প্রয়োগ করার পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থায় শিশু-কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্ম চরম হুমকি ও সংকটের মুখে পতিত হবে। তাই শিশুদের অপরাধ মুক্ত করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষে শিশু আইনের সাথে প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

নারী উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা এক ধরনের অজ্ঞতা। সমাজ পরিচালনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পুরুষকে একধাপ দায়িত্ব বেশী প্রদান করেছেন। প্রাক ইসলামী যুগে বিশেষভাবে মহানবী স. এর জন্মের পূর্বে কন্যা সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতো। এমনকি তাদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো।[১] ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারীরা এখনও সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। হিন্দুধর্মে এখনও দেব দাসী প্রথা চালু রয়েছে, প্রতি বছর পার্শ্ববর্তী ভারতে প্রায় সহস্রাধিক মেয়েকে বলী দেয়া হয়। বর্তমান বিশ্বে নারীদের অধিকার, ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ইত্যাদির প্রশ্নে পাশ্চাত্যকে বেশি সোচ্চার মনে হয়। পাশ্চাত্যের সাথে সুর মিলিয়ে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রও নারীদের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হচ্ছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশে ঘোষিত "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর কোন ধারা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা, আবার ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত নারী উন্নয়ন ও এর পরিধি কি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাই আলোচিত হয়েছে।]

প্রস্তাবনার পক্ষে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও এর কারণ

কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্নয়ন-অগ্রগতি নির্ভর করে তার মধ্যকার শ্রেণী ও সমাজগোষ্ঠীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায় ভিত্তিক সহাবস্থানের ওপর। এজন্যে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য রেখে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সু-সংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে দেবে।"

সম্প্রতি নারী উন্নয়নের নামে একদল বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষের আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্য করে চলছেন এবং নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বে এখনও মুসলমান পরিবারসমূহে পারিবারিক শৃঙ্খলা আছে। এখানে এখনও পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী সকলকে নিয়ে বড় পরিবারে বাস করার প্রথা প্রচলিত। আবার শুধু স্বামী-স্ত্রী সন্তান নিয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার দৃষ্টান্তও অসংখ্য। পৃথিবীতে যে সব দেশে সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা না থাকার কারণে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে নেই তারাই নারী উন্নয়নের শ্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছে। অতএব মানুষকে বিভ্রান্তি মুক্ত করার জন্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। 'নারী উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে নারীরা সীমাহীন লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার। অথচ ইসলামের পর্দা, হিজাব, স্কার্ফ, আল-কুরআনের উত্তরাধিকার আইন, নারী নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রগতি ও নারী উন্নয়নের নামে মুসলিম নারীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। যার ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে। কতিপয় নারী প্রগতিবাদী ও বুদ্ধিজীবী কুরআনের এতদসংক্রান্ত বিধানেরও পরিবর্তন আনার প্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ দেখা যায়, বর্তমানে পাশ্চাত্যে নারী অফিসের টাইপিষ্ট ও সেক্রেটারী, দোকানে সেলস গার্লস, হাসপাতালে নার্স, উড়োজাহাজে এয়ার হোস্টেস, এমন কি যুদ্ধের মাঠেও পুরুষের চিত্তরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি হোটেলে, নাইট ক্লাবে নারীরা পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নারীকে মঞ্চে, টিভিতে এবং সিনেমার পর্দায় নগ্নভাবে দেখানো হয়। মডেলিং আর বিজ্ঞাপনে তাদেরকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন রূপে ব্যবহার করছে। বাণিজ্যিক অতিথিদের আদর আপ্যায়নে এবং ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার করা হয়। জীবজন্তু বা অন্যান্য পণ্যের মত নারীদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনে ব্যবহার করা হয়। প্রগতির পথে অগ্রসর নারীদের বিবাহিত জীবন যাপন থেকে দূরে রেখে লীভটুগেদারে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে গর্ভধারণ করলে গর্ভপাতের জন্য ক্লিনিকে গর্ভপাতের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবছর শুধু পাশ্চাত্যের স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় ৪ থেকে ৫ হাজার অবৈধ গর্ভপাত হয়। অবৈধ গর্ভপাতের পরও জারজ সন্তানদের মাকে কুমারী মাতা বলে।

আমেরিকায় প্রতিদিন যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তার একটি বর্ণনা নিম্নরূপ–
(a) Crime every 2 seconds, (b) Property Crime every 3 seconds, (c) Minor Stealing every 4 seconds, (d) Burglary every 11 seconds, (e) Car thief every 20 seconds, (f) Violent crime every 16 seconds, (g) Robbery every 48 seconds, (h) Rape every 21 seconds, (j) Murder every 5 minutes.
In the United States AIDS in now the prime cause death for men, aged 25 – ৪৪ and the forth most important for women in that age group.[২]

নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফীর পপুলেশন কাউন্সেল পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা যায়, ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলোতে তালাকের হার দ্বিগুণ বেড়েছে। ১৯৮৫ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে আমেরিকায় শতকরা ৬০ ভাগ বিয়ে ভেঙ্গে গেছে তালাকের মাধ্যমে।

ইউনাইটেড কিংডমের প্রদেশ 'ওয়েলস' আর ওয়েলস এর এম.পি হচ্ছেন জন বেডউড। তিনি তার এক ভাষণে ওয়েলস এর হাউজিং স্টেটগুলোতে যে হারে কুমারী ও কিশোরী মাতার সংখ্যা বাড়ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গোটা হাউজিং স্টেটের ৬৫% ছেলে মেয়ে অবৈধ। তাদের কোন পিতৃ পরিচয় নেই, এরা সবাই অভিভাবকহীন। ফলে এরা নানা অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ঐ বছর যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার ৩২.৬% হল বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলনের ফল[৩], এরপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণে কি ধরনের বিধান রেখেছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

১. ইসলামে কন্যা সন্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

মহানবী স. কন্যা সন্তান হত্যা ও জীবিত কবরদানকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তখনকার মানুষগুলোকে কন্যা সন্তান লালন পালনে উৎসাহিত করতে একদিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করেন, অপরদিকে কন্যা সন্তানকে সৌভাগ্যের প্রতীক আখ্যা দিয়ে কন্যা লালন-পালনকারীদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। কন্যা সন্তানদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে মহান আল্লাহ

---

২. U.S Crime statistice (FIB) time 1994

৩. *The World Alamance 2001*

ঘোষণা করেন– "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[৪]

২. কন্যাসন্তান বা নিষ্পাপ শিশু হত্যা সম্পর্কে পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ

মানুষ হত্যার মত জঘন্য অপরাধের জন্য পার্থিব জীবনেই শুধু শাস্তির বিধান রাখা হয়নি এজন্য পরকালেও ভোগ করতে হবে কঠোর শাস্তি এবং হতে হবে বিচার ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?"[৫]

উপর্যুক্ত আয়াতের বর্ণনাভংগীতে কন্যা সন্তানের ঘাতকদের প্রতি মারাত্মক ধরনের ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। যে পিতা-মাতা মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে।

৩. কন্যা সন্তানদের সযত্নে প্রতিপালনকারীদের জন্য সুসংবাদ

নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। নারীদেরকে সমাজের নির্দয়-নিষ্ঠুর অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন, শিক্ষাদান, সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলাকে পুণ্যের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে জাহেলী সমাজের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টিয়ে দেয়া হয়েছে।

মহানবী স. বলেছেন– "যে মুসলমানের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালভাবে রাখে তা হলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[৬]

মহানবী স. কর্তৃক কন্যা সন্তানদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার মহতি উদ্যোগে তাদের লালন-পালনে যত্নবান হওয়ার জন্যে পিতা-মাতাকে যে সুসংবাদ শোনান হয়েছে তাতে কেবল আরবেই নয় দুনিয়ার অন্যান্য জনপদেও ইসলামের ছায়াতলে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের দৃষ্টিভংগী এবং চরিত্র উভয়রেই পরিবর্তন হয়েছে।

---

৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩১

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا -

৫. আল-কুরআন, ৮১ : ৮

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ - بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ -

৬. ইমাম, বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনু. আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ. ৫৯ ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما الا ادخلتاه الجنة

৪. ইসলামে নারীর স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় পুরুষের মত নারীদেরও স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। একজন পুরুষ যেমন স্বাধীনভাবে প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, সম্পত্তি উপার্জন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, তেমনি একজন নারীও স্বাধীনভাবে উক্ত কাজসমূহ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা-মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। আল-কুরআনের ভাষায়– "পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ, আর নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ"।[৭]

হাদীসে বলা হয়েছে– "সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।"[৮]

৫. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

একজন সাবালক নারী সাবালক পুরুষের মত নিজের জীবন সঙ্গী বেছে নিতে পারবে, এ ব্যাপারে তাকে কোনভাবে বাধ্য করা যাবে না। এমনকি কোন মেয়েকে নাবালক (অপ্রাপ্ত বয়স্কা) অবস্থায় তার অভিভাবক বিবাহ দিলে সে বালেগ হওয়ার পর উক্ত বিবাহ বহাল অথবা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৬. দাম্পত্য জীবনে নারীর আর্থিক সুবিধা

ইসলাম দাম্পত্য জীবনে আর্থিক সুবিধা নারীদের জন্যই কেবল নির্ধারণ করেছে। মোহরানা স্বরূপ এই আর্থিক নিরাপত্তা লাভ না করলে নারী দাম্পত্য কর্তব্য পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে পুরুষের আইনগতভাবে কিছুই করার নেই।

৭. সন্তানের তত্ত্বাবধান

ইসলামে সন্তানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়ের। কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সন্তান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে। বালেগ হওয়ার পর সন্তান পিতা-মাতা যে কোন একজনের সাথে বাস করার অধিকার রাখে। তবে সন্তান যেখানেই থাকুক না কেন পিতাকেই সন্তানের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে।[৯]

---

৭. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

৮. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : কাওলুল্লাহি তা'আলা, আতি উল্লাহা ....., আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৫৯৫ الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

৯. রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, খ. ১, ধারা-৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭

৮. নারীদের শিক্ষার অধিকার

ইসলাম জ্ঞান অর্জন বা সুশিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনি বরং নারী পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছে। মহানবী স. বলেছেন– "প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"[১০]

কুরআন মাজীদে নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

"পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। আর পড় তোমার প্রভু মহামহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[১১]

বর্তমান মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এটি ইসলামের তৈরী নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাই এর জন্য মূলত দায়ী। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীর তালিকায় যেমন আবু হুরায়রা রা. রয়েছেন তেমনি আছেন মহিয়সী নারী আয়েশা রা.।

৯. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

ইসলাম বিদ্বেষী বুদ্ধিজীবীরা নারীদের উত্তরাধিকা ব্যবস্থা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি জানায় এবং নারীকে কেন পুরুষের তুলনায় পিতার সম্পদে কম দেয়া হয় এ বিষয়ে পূর্বাপর বিস্তারিত বিশ্লেষণ না করে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। অথচ প্রাক ইসলামী যুগে নারীদেরকে উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে যে জুলুম তাদের প্রতি করা হয়েছিল সেই জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ইসলাম নারীকে মিরাসে অংশীদার বানিয়ে মজলুম নারী জাতির অধিকার নিশ্চিত করেছে।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন– "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।"[১২]

---

১০. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামা ওয়াল-হিস-সি আলা তালাবিল ইল্‌ম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৪৯১ طلب العلم فريضة على كل مسلم

১১. আল-কুরআন, ৯৬ : ১-৪

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -

১২. আল-কুরআন, ৪ : ৭

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাসসির সাইয়েদ কুতুব বলেন, এটিই হচ্ছে সাধারণ মূলনীতি। জাহেলী যুগে তাদেরকে যুদ্ধ ও উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন মনে করে তাদের সামাজিক মূল্যমান নির্ধারণ করা হতো। ইসলাম মানবিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে দেখে নারীর অবস্থান নির্ধারণ করেছে।[১৩]

কুরআন মাজীদে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মূলনীতি ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন– "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যাই হয় দু-এর অধিক তবে তাদের জন্যে ঐ সম্পদের $\frac{২}{৩}$ ভাগ যা মৃত ব্যক্তি ত্যাগ করে এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্যে $\frac{১}{২}$। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে $\frac{১}{৩}$। অতঃপর মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তবে তার মাতা পাবে $\frac{১}{৬}$ অছিয়তের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ।"[১৪]

সূরা আন-নিসার উপর্যুক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে সার্বিক বিষয় বিবেচনায় না রেখে একদল লোক ইসলাম নারীর চেয়ে পুরুষকে দ্বিগুণ সম্পদ দিয়ে নারীর প্রতি অবিচার করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করছে। অথচ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, সূরা আন-নিসার ১১-১২নং আয়াতে বর্ণিত অংশগুলো অর্জনকারীদের সংখ্যা ১২ জন, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মাত্র চারজন আর নারীর সংখ্যা আটজন। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, মিরাসে নারীর অধিকার ইসলাম পরিপূর্ণ, যৌক্তিক এবং ন্যায় ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ করেছে। একটি ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারী কম পেলেও ক্ষেত্র বিশেষে নারী

---

১৩. কুতুব, সাইয়্যিদ, *ফি যিলালিল কুরআন*, জেদ্দা : দারুল ইলম, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৫৮১-৫৮২

১৪. আল-কুরআন, ৪ : ১১

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن
كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ
وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ۔

বেশি পায়। যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও বাবা রেখে মারা যায় তা হলে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$, মেয়ে $\frac{১}{২}$ এবং বাকী সম্পদ আছাবা হিসেবে পিতা পাবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, মেয়ে ও পিতা-মাতা রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$, পিতা-মাতা প্রত্যেকে $\frac{১}{৬}$ মেয়ে পাবে $\frac{১}{২}$ । উল্লিখিত ন্যায় ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা ছাড়াও কতিপয় যৌক্তিক কারণে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ সম্পদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণগুলো নিম্ন রূপ–

১. নারীদের ব্যয়ভার বহন করা তার পিতা, স্বামী, ভাই, ছেলে বা অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়ের উপর কর্তব্য। একজন নারী এ ধরনের আর্থিক বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২. একজন নারী ভাই, বোন, স্বামী, পিতার বা পুরুষের ব্যয়ভার বহনে শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট নয়।

৩. একজন পুরুষের ব্যয়ের আবশ্যকতা নারীদের তুলনায় অধিক এবং ব্যাপক।

৪. পুরুষেরই স্ত্রীকে মোহরানা দিতে হয়। নারী পুরুষকে বাধ্য হয়ে কোন কিছু দিলে তা পুরুষের জন্য যৌতুক বা হারাম হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষ নারীকে যত বেশি সম্পদ দান করবে তা হবে পুণ্যের কাজ। তবে নারী পক্ষ স্বামীকে স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারে।

৫. সন্তানের পড়া শোনা ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা , বাসস্থান ইত্যাদি পুরুষকেই বহন করতে হয়, এক্ষেত্রে নারীর কোন দায়িত্ব নেই।

৬. আয়-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার দায়িত্ব পুরুষকে গ্রহণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে নারীর কোন দায়িত্ব নেই। পুরুষের সম্পদের আবশ্যকতা বেশি। তাই ন্যায় ও ইনসাফের প্রমাণে পুরুষের উত্তরাধিকারে অংশ অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[১৫]

ইসলামে নারীর ওপর কেন অর্থোপার্জনের ও পুরুষের ন্যায় দায়-দায়িত্ব বহনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করল না ? এ প্রশ্নের জবাবে সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী বলেন, জীবিকা উপার্জনের জন্য নারীর বাইরে শ্রম দেয়ার

১৫. মুস্তাফা, সাইয়্যেদা কানিজ, *ইসলামে নারীর অধিকার*, কলিকাতা : বাণী প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ.৮৮-৮৯

চাইতে গৃহস্থালীর কাজে আত্মনিয়োগ করা তার মানবিক মর্যাদাকে আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ইসলামের নীতি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

এছাড়া বাহ্যিকভাবে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে নারীর চেয়ে পুরুষের অংশ বেশি মনে হলেও নারীই বেশি পেয়ে থাকে। একটি সাধারণ হিসেবের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলা যায়।

যেমন এক ব্যক্তি মৃত্যুর পর ১ ছেলে ১ মেয়ে রেখে গেল এবং ঘরে নগদ ৩০০০ টাকা রেখে গেল। ইসলামী বিধান অনুযায়ী ছেলে পাবে ২০০০ টাকা এবং মেয়ে পাবে ১০০০ টাকা। উভয়ের বিয়ের সময় ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২০০০ টাকা মোহর দিয়ে বিয়ে করল। ফলে তার হাতে কোন টাকা অবশিষ্ট থাকলো না। আবার বিয়ের পর অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান, এর যাবতীয় খরচ তার উপরই ন্যস্ত হলো। পক্ষান্তরে মেয়ে ২০০০ টাকা মোহরের বিনিময়ে কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। তাহলে মেয়ে বাবার নিকট থেকে ১০০০ টাকা আবার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা বাবদ ২০০০ টাকা পেল। মোট তার টাকার পরিমাণ হল ৩০০০ টাকা। অতঃপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর বাসস্থানসহ যাবতীয় খরচ প্রদানে স্বামী দায়িত্বপ্রাপ্ত, যতক্ষণ স্ত্রী তার অধীনে থাকবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেয়ের সম্পদ বৃদ্ধি পেল, ছেলের সম্পদ কমে গেল। অতএব এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইসলাম নারীকে কোনভাবেই বঞ্চিত করেনি। বরং বলতে হবে, ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে।

১০. নারীর সম্পত্তি অর্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার

যে কোন নারী বৈধ পন্থায় বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্পদ উপার্জন করতে পারে। তার উপার্জিত সম্পদে কারোর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কুবরা রা. মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। তার বাসভবন তখনকার যুগে একটি ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। তিনি উপার্জিত সম্পদ থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অকাতরে ব্যয় করতেন।

আবু দারদা রা. এর স্ত্রী একজন ধনবতী নারী ছিলেন, কিন্তু স্বামী ছিলেন দরিদ্র। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী একজন গরীব মানুষ। তার সন্তানদের ভরণ-পোষণে তার কষ্ট হয়। আমি কি আমার যাকাতের অর্থ স্বামীকে দান করতে পারি? মহানবী স. সম্মতি দিলেন কিন্তু একথা বললেন না যে, তোমার সম্পদে তোমার স্বামীরও অধিকার আছে এবং সেও তা যথেচ্ছভাবে ভোগ ব্যবহার করতে পারবে।

১১. নারীর চাকুরী করার অধিকার

নারী চাকুরী করতে বাধ্য নয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে হিজাবের বিধান মেনে চাকুরী করতে পারে। নারীদের বাইরে কাজ করার বিরুদ্ধে শরীয়তের কোন অকাট্য দলীল নেই। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, "তোমরা জাহেলী যুগের নারীদের মত বের হয়ো না"। অতএব শালীন ও মার্জিত পোশাকে বের হওয়া দূষণীয় নয়। "ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে, নারী শ্রম বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।"[১৬]

ইসলাম নারীর সতীত্ব, রূপ লাবণ্য হেফাজত করা এবং সন্তান প্রতিপালনের মত গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যে গৃহে শ্রম বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে। কারণ আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে আদর্শ নাগরিক তৈরী করা। ফলে সংসারের কষ্টসাধ্য উপার্জনের গুরু দায়িত্ব পুরুষকে আর সন্তান লালন ও গৃহাভ্যন্তরের পরিবেশ রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করেছে, এতে কোন ক্রমেই নারীকে অসম্মান করা হয়নি।

১২. নারী স্ত্রী হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী

ইসলাম নারীকে বংশের গোড়াপত্তনকারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে স্বামীর জন্য তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন– "এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এটাও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রজাতিরই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে প্রেম ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[১৭]

স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক, কুরআন মাজীদ বিষয়টিকে চমৎকার ভাষায় উল্লেখ করেছে– "স্ত্রীরা তোমাদের (স্বামীদের) জন্য ভূষণ এবং তোমরা তাদের জন্য ভূষণ।"[১৮]

---

১৬. আল-কাসানী, আলা উদ্দিন, ইমাম, *বাদায়ে আস-সানায়ে*, তা. বি. খ. ৪ (উর্দু), পৃ. ৪৯৭-৪৯৮
১৭. আল-কুরআন, ৩০ : ২১

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ·

১৮. আল-কুরআন, ২ : ১৮৭

লেবাস বা ভূষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আবৃত করা বা লজ্জাস্থান ঢাকা এবং শারীরিক সৌন্দর্য বর্ধন ও শরীরকে ধূলাবালি থেকে হেফাজত করা। কাজেই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের একান্ত গোপনীয় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির জন্য যেমন আবরণ হওয়া উচিত তেমনি একে অপরের মান মর্যাদার নির্ভরযোগ্য সোপান হওয়া উচিত।

পশ্চিমা জগতে স্ত্রীকে House wife বলে থাকে। মুসলমানগণও শব্দটির তাৎপর্য না বুঝে প্রয়োগ করে থাকে। শব্দটির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক স্পষ্ট হয় না বরং শব্দটির এভাবে প্রয়োগ যথার্থ নয়। কেননা, House wife অর্থ– ঘরের বউ বা বাড়ির বউ আর তার বিবাহ তো ঘর বা বাড়ীর সাথে হয় নি বরং বলা উচিৎ (House Ledar) ঘরের নেত্রী বা গৃহকর্তী।[১৯]

১৩. নেতৃত্বে নারীর অধিকার

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পুরুষ যুগ যুগ ধরে কর্তৃত্ব করে আসছে। কর্তৃত্ব করার গুণাবলী, সাহস, আল্লাহ তাআলা পুরুষদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে নারী পুরুষকে সমান করার চেষ্টা শুধু যে দীনের পরিপন্থি কাজই নয়, প্রকৃতি বিরোধীও বটে।

নেতৃত্বের ব্যাপারে ইসলামের স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে, নারী অঙ্গনে নারীরাই নেতৃত্ব দেবে। যেমন মহিলা স্কুল, মাদরাসা ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা অধিদপ্তর, ইত্যাদিতে মহিলাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী পুরুষ মিশ্রিত সমাজে ও যেখানে পুরুষদের প্রাধান্য সেখানে পুরুষের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব থাকবে। যেমন রাষ্ট্র পরিচালনা, সেনাপ্রধান হওয়া, প্রধান বিচারপতি হওয়া ইত্যাদি। তবে কোন সমাজে যদি পুরুষরা অযোগ্য হয় তখন আপনা আপনি নারীদের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিতে হয়, এটি একটি ব্যতিক্রম ব্যাপার মাত্র। নারী-পুরুষের মধ্যে নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের জন্য রয়েছে ঊর্ধ্বতন একটি অবস্থান"।[২০]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

১৯. নায়েক, ডা. জাকির, *ইসলামে নারীর অধিকার* ঃ অনু. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ১৫

২০. আল-কুরআন, ২ : ২২৮

অনেকেই উল্লিখিত আয়াতের অনুবাদ করেছেন পুরুষের মর্যাদা নারীর উপর এক স্তর উপরে। আসলে এটি সঠিক অনুবাদ নয় বরং এর সঠিক ভাব হবে দায়িত্বের মাত্রা বেশি। আলোচ্য আয়াতটি বুঝতে হলে সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটিকেও সামনে রাখতে হবে, কারণ আল-কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের বিশ্লেষক। যেমন মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন– "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।[২১]

আলোচ্য আয়াতে 'কাউয়াম' (قوام) শব্দটির অর্থ গ্রহণ করা হয়– এক স্তর উর্ধ্বতন অথবা পুরুষ মর্যাদায় এক স্তর ওপরে। অথচ প্রকৃত সত্য হলো এই, ক্বাউয়াম (قوام) শব্দটি আরবী 'ইক্বামাহ' শব্দ থেকে নির্গত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নামাযের পূর্বে ইকামাত হয়। যার মানে নামাযের জন্য দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে যাওয়া। অতএব ক্বাউয়াম শব্দটির মানে এটা নয় যে, পুরুষ নারীর উপরে একস্তর উর্ধ্বতন বা মর্যাদার এক স্তর ওপরে। বরং প্রকৃত অর্থ হবে এই, সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পুরুষের দায়িত্ব একমাত্রা বেশি।[২২]

কাউয়াম (قوام) শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ কর্তা, রক্ষক (sustairer, provider), অভিভাবক, protector পরিচালক। সুতরাং ক্বাউয়াম (قوام) অর্থ বেশী মর্যাদার অধিকারী বলা সঠিক নয়। মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব এক বিষয় নয়। সমাজে মর্যাদায় দুই ব্যক্তির মধ্যে কর্তৃত্বের গুণাবলী সমান থাকে না। কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের জন্য আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

প্রখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর র. ও قوام এর তরজমা করেছেন পুরুষের দায়িত্ব একমাত্রা বেশি। আর এ দায়িত্ব উভয়ের পারস্পরিক সহানুভূতি, অনুরাগ ও ভালোবাসার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আদায় করার চেষ্টা করা উচিত।

১৪. পর্দা বা হিজাবের বিধানের তাৎপর্য

নারী এবং পুরুষের দৈহিক গঠন প্রণালীর ভিন্নতা এবং আল্লাহ্ তাআলা পরস্পরের নিকট পরস্পরকে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করার কারণে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক।

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

২১. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ -

২২. নায়েক, ডা. জাকির, *ইসলামে নারীর অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

আল্লাহর ভাষায়– "মানুষের নিকট নারীকে সুশোভিত করা হয়েছে।"[২৩]

প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রতি আকর্ষণ নেই কেবল যৌনস্পৃহা মুক্ত ব্যক্তিদের। এছাড়া সকল পুরুষের নারীর প্রতি রয়েছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতি, নারী দেহ অম্লধর্মীয় আর পুরুষের দেহ ক্ষারধর্মীয়। টক জিনিস দেখা মাত্র জিহ্বায় লালা আসে আর মিষ্টি দেখলেও খেতে ইচ্ছে করে। নারীর অম্লত্ব আর পুরুষের ক্ষার দুটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অম্ল এবং ক্ষার যখন একত্র হয় তখন অম্লত্বের অম্ল আর ক্ষারের ক্ষারত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষায় 'Nutralisation' বা নিরপেক্ষীকরণ বলা হয়। এছাড়া নারী ও পুরুষের দেহের হরমোন এর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে ধীরে ধীরে 'hormonal change' হয়ে যেতে পারে। হিজাব বিহীন নারীর খোলা-দেহে অসংখ্য পুরুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়। শয়তান তখন নারীকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করার জন্য পুরুষের মনকে উসকিয়ে দেয়। তখন মানুষ নারী ধর্ষণসহ বহুবিধ অশ্লীল কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। "বর্তমান যুগে এসিড নিক্ষেপ, কিডনাপিং, নারীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদির পেছনে যৌন কারণ ৭০%। তাই আল্লাহ তাআলা নারীর সতীত্ব রক্ষা, দৈহিক সৌন্দর্য সুষমা অসৎ লোকদের কুদৃষ্টি হতে রক্ষা, নারীর সম্মান, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পর্দার বিধান জারী করেছেন। যারা পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করে তারা পর্দার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। ইসলাম নারী সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই পর্দার বিধান দিয়েছে। ইসলাম চায় না নারী সমাজের নোংরা, ভখাটে, দুশ্চরিত্র পুরুষের লালসাকাতর দৃষ্টির শিকার হোক, অথবা রূপ জৌলুস পানশালা, নাইট ক্লাব, নৃত্যশালা কিংবা বেশ্যালয়ের বিক্রয় পণ্য হোক। ইসলাম মডেলিং এর নামে নারীর খোলা দেহ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে সমাজের যুবকদের অবৈধ যৌন কাজে উৎসাহ আর অশ্লীলতার প্রসার কখনো অনুমোদন করে না।

আমাদের দেশের মুসলিম নারীরা পাশ্চাত্যের নওমুসলিম নারীদের দেখলে নতুন প্রেরণা লাভ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নারীরা পাশ্চাত্য সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে স্বেচ্ছায় হেজাব, স্কার্প মেনে নিয়েছে। এখানে কতিপয় নারী, নারী অধিকারের নামে ইসলাম, হেজাব, স্কার্প, ইত্যাদি ইসলামী ভূষণের বিপক্ষে কথা বলছেন, পাশ্চাত্যে মুসলিম নারীরা পর্দার পক্ষে কথা বলছেন, ফলে পর্দা

---

২৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৪

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ •

প্রগতির অন্তরায় একথা কোন ভাবেই যুক্তিসংগত নয়। ওড়না, হেজাব বা বোরকা ইত্যাদি ইসলামী লেবাসের বিরুদ্ধে কোন মুসলিম নারীর বিরুদ্ধাচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ওড়না পরা আল-কুরআনেরই নির্দেশ। যেমন বলা হয়েছে– "মুসলিম নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তা তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা, বক্ষদেশ ও মাথায় কাপড় দিয়ে আবৃত করে।"[২৪]

১৫. নারীর ভোটাধিকার

নারীরা পুরুষের মত সমাজের অর্ধেক, তাদের অগ্রাহ্য করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক নয়। নারীদের ভোট বা মতামত দেয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধানে দেখা যায়, এর বিপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বরং নারীর ভোট বা মতামত গ্রহণের পক্ষে দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উসমান রা. খলিফা হওয়ার পূর্বে নির্বাচনের সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীদের ও অন্যান্য অভিজ্ঞ মহিলাদের বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করেছেন। মহিলাদের মতামত এড়িয়ে যাওয়াই যদি শরীয়তের বিধান হতো, তবে তিনি এটা করতেন না, করলে সাহাবাগণ বাধা দিতেন। উম্মতের খিলাফত ব্যবস্থার যৌথ উদ্যোগে নারীরাও অংশীদার। ভোট দেয়ার অর্থ হলো মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অংশের খেলাফতকে এক ব্যক্তির তথা আমীরের এখতিয়ারে সোপর্দ করবে। সুতরাং নারীদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার সপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই।[২৫]

১৬. যৌতুকের অভিশাপ থেকে মুক্তি

নারী উন্নয়ন ও নারীর অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যৌতুককে হারাম ঘোষণা করা। 'যৌতুক' বাংলা শব্দ। ইংরেজী প্রতিশব্দ Dowry (Property or money brought

২৪. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

২৫. সিদ্দিকী, নঈম : *নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম*, অনু. আকরাম ফারুক ও আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৭

by a BRIDE to her husband when they marry: the dowry system . আরবী ভাষায় যৌতুক শব্দের হুবহু কোন প্রতিশব্দ পাওয়া না গেলেও হাদীসে কাছাকাছি অর্থের جهاز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে ومن يوق شح نفسه আয়াতে شح শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য جهاز শব্দের সাথে চাপ প্রয়োগ বা شح অর্থ দান এসব শব্দের সাথে চাপ প্রয়োগের সংশ্লিষ্টতা না থাকাতে বাংলা যৌতুকের অর্থে বলা যায় না। তবে কারো কারো মতে আরবী بائنة এবং دوحة ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৌতুক বুঝানো হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত যৌতুক হচ্ছে বর পক্ষের কেউ অথবা বর নিজে কন্যা পক্ষ থেকে কোন সহায় সম্পদ, নগদ অর্থ অথবা কোন বৈষয়িক স্বার্থ প্রদানের শর্তে বিবাহ করা এবং তা আদায় করা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ্ বলেন– "হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[২৬] এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরীয়তে বিবাহে পুরুষের ওপর নারীর প্রতি মোহরানা আদায় করা ফরয। মোহরানা আদায় না করে অথবা মোহরানা আদায় করার পর কন্যা বা কন্যাপক্ষ থেকে অতিরিক্ত কোন কিছু আদায় করা বা দাবি করার নাম যৌতুক। যৌতুকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের সুখময় পরিবেশকে দুর্বিসহ করে তোলা হয়। উভয় পক্ষের আত্মীয়তার বন্ধনকে নড়বড়ে করে দেয়া হয়। অবশ্য কন্যা পক্ষ যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় বরকে কোন কিছু দেয় তা হলে তা বৈধ হবে।

সুতরাং কন্যাপক্ষ থেকে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা তো দূরের কথা কেউ যদি মোহর ধার্য করে আদায় না করে অথবা স্ত্রী বা স্ত্রীপক্ষ থেকে কর্জে হাসানা গ্রহণ করে আদায় না করে তাকে হাদীস শরীফে ব্যভিচারী ও চোর আখ্যা দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন– "যে ব্যক্তি বিবাহ করে মোহরানা নির্ধারণ করে কিন্তু নিয়ত করে তা আদায় করবে না, তাহলে সে ব্যভিচারী।"

১৬. মা হিসেবে নারীর মর্যাদা

পিতা-মাতা প্রত্যেক মানুষের জন্য পরম শ্রদ্ধার বিষয়। পিতা-মাতা উভয়ই সন্তানের লালন-পালন ও সন্তানকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। উভয়ের মধ্যে মায়ের কষ্টের তুলনা নেই।

---

২৬. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ এবং রসূলের পর সন্তানের জন্য সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী হচ্ছেন মা। মায়ের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি নারী জাতিকে মহিমান্বিত করেছে। আবু হুরায়রা রা. একটি হাদীস থেকে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

"আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রসূল! আমার সর্বোত্তম ব্যবহার এর হকদার-কে বেশি? মহানবী স. বললেন, তোমার মা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? তিনি এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলো এবার তিনি জবাব দিলেন তোমার মা চতুর্থবার প্রশ্ন করলো এরপর কে ? জবাবে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, তোমার পিতা।"[২৭]

১৮. আন-নিসা 'নারীকুল' নামে সূরা সংযোজন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশ্ব মানবতার হেদায়াত ও মুক্তির পূত পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থেও 'নারীকুল বা আন-নিসা' নামে একটি সূরা সংযোজিত হয়েছে, যা নারী জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কিন্তু কুরআনের কোথাও الرجال বা পুরুষকুল নামে কোনো সূরা সংযোজিত হয়নি।

১৯. সতী-সাধ্বী নারী আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সম্পদ

ইসলাম নারীদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের আসনে বসিয়েছে। সৎ কর্মশীল বা সতী সাধ্বী নারীকে মহানবী স. শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেছেন। যেমন– "সমগ্র দুনিয়াই মানুষের সম্পদ তন্মধ্যে নেক নারী হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ।"[২৮]

নারী না হলে পৃথিবীতে আজ কোন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, কবির আবির্ভাব হতো না। নারীরাই মাতৃছায়া আর ៤ হ যত্ন দিয়ে মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। এই হাদীসটিতে নারীর নৈতিক মানের দিকটি আলোচিত হয়েছে। কেননা, নারীর উন্নত নৈতিক মানের মাতৃজাতি ছাড়া কোন নৈতিকমানে উন্নত জাতির উদ্ভব হতে পারে না। সন্তান পিতার চেয়ে মায়ের নৈতিকতা ধারা বেশি প্রভাবিত হয়।

---

২৭. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান আহাক্কুন্ নাসি বি-হুসনিস সুহবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬
عن ابى هريرة (رضـــ) قال جاء رجل الى رسول الله (صـــ) فقال يارسول الله من احق بحسن صحابتى؟
قال امك قال ثم من؟ قال ثم امك قال ثم من؟ قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك -

২৮. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আর-রাদা, অনুচ্ছেদ : খাইরু মাতা'য়িদ দুনইয়া, আল-কুতুবুল সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৯২৬ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

নারীর দেহমন, ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে নারী মুক্তি, নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার ও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি চমকপ্রদ শ্লোগান দিলেও প্রকৃত অর্থে প্রগতির নামে নারীকে নির্লজ্জ ও উচ্ছৃঙ্খল এবং সর্বোপরি পুরুষের প্রতিপক্ষ বা শত্রুতে পরিণত করার অপতৎপরতা চলছে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয় হচ্ছে সরকার ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। এ বিষয়ে একটি মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হলো :

২০. নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ : একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন

"নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" নিয়ে দেশ আজ নতুন বিতর্কে অবতীর্ণ। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৯৭ সালে প্রথম নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। ২০০৪ সালে ৪ দলীয় জোট উক্ত নীতিতে কিছু পরিবর্তন আনে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নারী উন্নয়ন নীতি সংশোধন করে নতুন করে প্রণয়ন করে কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ২০১১ সালে বর্তমান সরকার নতুন করে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, নারী সমাজের অর্ধেক তাদের প্রতি অবহেলা করে কখনো দেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নতি সম্ভব নয়। ইসলাম নারীর জন্য যে সব অধিকার নির্ধারণ করেছে তা নিশ্চিত করা মুসলিম সরকারের দায়িত্ব। নারী উন্নয়ন নীতি ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নয়, বরং অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীকে পশ্চাতপদ অবস্থান থেকে উদ্ধার করা সরকারের পাশাপাশি সকল সচেতন নাগরিকদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ইসলাম মৌলিক মানবিক অধিকারে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য কখনো করেনি, ভারসাম্য বিধান করেছে। বর্তমান নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে নারীর দৈহিক গঠন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা শারীরিক ক্ষমতাকে সামনে রেখে তাদের কার্য পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহর তৈরি ব্যবধানকে চরম ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

"নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" এর কতিপয় ধারা নিয়ে বাংলাদেশে আলিমগণ ঘোর আপত্তি তুলেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, এর অনেক ধারা কুরাআন ও সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক। সংগত কারণে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান হচ্ছে অত্যন্ত ন্যায় ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ, কল্যাণকর। ইসলামের দৃষ্টিতে যে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও রসূলের সুন্নাহ (আদর্শ) মেনে চলার জন্য কালেমা পড়ে মনে প্রাণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন মেনে নিতে পারেন না। এটাই ঈমানের দাবি।

নারী উন্নয়ন নীতির কতিপয় ধারা কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

২৩.৫ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া

এ ধারাটি একটি অস্পষ্ট ধারা হওয়ায় উলামাগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কারণ এখানে সম্পদ একটি ব্যাপক শব্দ যা সব ধরনের সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যাপক শব্দ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে স্থাবর-অস্থাবর, উত্তরাধিকার সম্পদসহ সব ধরনের সম্পদ উদ্দেশ্য হতে পারে। ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত লিফলেটে সম্পদ দ্বারা যৌথ ব্যবসায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। ঠিক কেউ যদি এই শব্দ (সম্পদ) দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উদ্দেশ্য নেয় তা হলে এ ধারাটি কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার ১১নং আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।

এখানে সম্পদ বলতে সরকার যে উত্তরাধিকার সম্পদ বুঝিয়েছেন শাসকদের প্রতিক্রিয়া থেকে এটিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্পদ বলতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যে বুঝানো হয়নি তা সুস্পষ্ট করে দেয়া সমীচীন।

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১এর কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী আরো কিছু ধারা কমপক্ষে ১৯টি ধারা কুরআন ও সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৬.১- "বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা"।

এ বিধানের মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান, প্রধান বিচারপতি হতে ও বাধা নেই অর্থাৎ পুরুষের নেতৃত্বের ক্ষেত্র এবং নারীর নেতৃত্বের ক্ষেত্র একাকার হয়ে যায়, যা ইসলামী আইনে বিতর্কিত বিষয়। আল-কুরআন, আয়াত ১৪, সূরা নিসা/বুখারী শরীফ, খ. ২, পৃ. ৬৩৭ আরবী)

এছাড়া ১৬.৮ / ১৬.১২ / ১৭.১ / ১৭.৮ / ১৭.৫ / ১৭.৬ / ১৭.৯ / ১৮.১ / ২০.০ / ২২.৩ / ২২.১ / ২২.৪ / ২৩.৫ / ২৫.২ / ৩২.১ / ৩২.৭ /৩২.৮[২৯] ধারাগুলো কুরআন মাজীদের সূরা আল-বাকারা, আয়াত– ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৩৭, ২৪১, সূরা আন-নিসা আয়াত- ৩২, ৩৪, ২৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৮, সূরা আল-আলাক, আয়াত– ১, ২, ৪, ৬, ৭, সূরা তাহরীম : আয়াত ২৭, সূরা শূরা, আয়াত-২৭, বুখারী শরীফের- ১ম খণ্ড ২০৯৭, খ. ২, ৭৭১ নং, মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ৪৫৬ নং হাদীস এর সাথে সাংঘর্ষিক।

---

২৯. নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ. ১১-১৩

১৭.২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে : নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

আলোচ্য ধারাকে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের আলিম সমাজ ইসলাম বিরোধী আইন বাস্তবায়নের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র যেমন মালয়েশিয়া, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, মিশর, লিবিয়া, লেবানন, সিডও সনদের কিছু ধারার ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি জানিয়েছে। অনেক অমুসলিম রাষ্ট্র ও তাদের সামাজিক কোড ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার সাথে সিডও সনদের অসঙ্গতি থাকায় তারাও আপত্তি জানিয়েছে। যেমন-যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ইসরাঈল, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি।

ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির ভবিষ্যত কুফল

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পাঠ করে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণ যে সব ক্ষতিকর ও ভয়ানক পরিণতির আশংকা করছেন তার কয়েকটি দিক হচ্ছে–

১. নারীর ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনার প্রতি পুরুষের আন্তরিকতা কমবে এবং বিমুখতা বাড়বে।
২. স্ত্রী যেভাবে মোহরের অধিকার রাখে, স্বামীও তখন যৌতুকের দাবি করবে। ফলে যৌতুক প্রথা বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।
৩. সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা হলে সমাজের বর্তমান শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হবে এবং ভাই-বোনদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট হবে।
৪. ধর্ষণ, ইভটিজিং, অপহরণ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।
৫. পাশ্চাত্যের মতো এদেশেও বিবাহ বহির্ভূত অপকর্ম বেড়ে যাবে।
৬. যৌথ পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে পড়বে।
৭. ঘোষিত নারী নীতিতে নারীর ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত কোন আলোচনা নেই, তাই মুসলিম নারীর হেজাব পরা এবং পর্দা করা সম্ভব হবে না।

সরকারের প্রতি কতিপয় পরামর্শ

- ইসলামী আইন ও বিধান বিশেষজ্ঞ আলিমদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নারী নীতি প্রণয়ন করা।
- বিতর্কিত ধারাগুলো সংশোধন করা।
- কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নারী অধিকার বাস্তবায়নে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিশ্চিত করা।
- নারীদের সম্মান, নিরাপত্তা, শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদের জন্য পৃথক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ, ইনসস্টিটিউট স্থাপন করা।

উপসংহার : উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতীয় অগ্রগতির যে কোন কর্মতৎপরতায় নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষে পৌঁছতে হলে নারী পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। তবে মানব জীবনের উন্নয়ন উপকরণ প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্র যেমন এক নয় তেমনি উভয়ের কর্ম প্রচেষ্টার ধরন প্রকৃতি ও কর্মস্থলও এক হওয়া জরুরী নয়। জীবন ধারায় নর-নারীর মধ্যে কার কোথায় স্থান, কে কোন ধরনের দায়িত্ব পালনে অধিক সফলতা অর্জনে সক্ষম, নারী শ্রমকে কাজে লাগাবার সময় সে তারতম্যকে সামনে রাখতে হবে। নর ও নারীর শারীরিক গঠন, দায়িত্ব, মানসিক তারতম্য একথারই প্রমাণ যে, মহান আল্লাহ নারীকে প্রকৃতিগতভাবে যে পরিমাণ কাজ ও শ্রমের ক্ষমতা দিয়েছেন তার চাইতে অতিরিক্ত কাজ আদায় করার চেষ্টা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতারই নামান্তর। প্রকৃতি বিরোধী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কখনো সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি হতে পারে না। নারী শ্রমকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে ইসলামের আপত্তি নেই, তবে এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের জন্য পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগি গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানদের প্রত্যেক কাজে ইসলামী দৃষ্টিভংগির অনুসরণ করার মধ্যেই অগ্রগতি, প্রগতি ও প্রভূত কল্যাণ নিহিত। মুসলমানদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও জাতীয় আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখেই নারীদের কর্মস্থল ও কর্ম পরিধি নির্ধারণ করতে হবে। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ নারীর সম-অধিকার, নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও নারী জাগরণের নামে নারীর যে অমর্যাদা ও অবমাননা করে চলছে নিজ সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক ভিতকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে মুসলিম নর-নারীকে এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই উভয়ের কর্মধারা নির্ধারণ করতে হবে। মূলতঃ ইসলাম প্রদর্শিত পথেই যথার্থ নারী উন্নয়ন সম্ভব হবে, অন্য পথে নয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

সাম্প্রতিক বিষয় : ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের গবেষণা পদ্ধতি

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

[সারসংক্ষেপ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে প্রতিনিয়ত মানুষ মুখোমুখি হচ্ছে নতুন নতুন সমস্যার। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন অনেক বিষয় কুরআন, সুন্নাহ'য় সরাসরি যে সম্পর্কে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি, হয়নি কোন সর্বসম্মত ইজতিহাদ। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উপস্থাপন অপরিহার্য। যাদের জন্য এ অপরিহার্যতা, যারা ফরযে কিফায়ার এ দায়িত্ব পালন করবেন তাদের জন্য রয়েছে অনেক করণীয়– যার কিছু এ সংক্রান্ত গবেষণা শুরুর পূর্বে এবং কিছু রয়েছে গবেষণা কর্ম শুরু করার সময়। শরীআহ অভিযোজন ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মত বিষয়ও করণীয় কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মহানবী স., সাহাবী ও তাবেঈগণ বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। তাদের অনুসৃত সে পদ্ধতির আলোকে সমকালীন সমস্যার সমাধানের পথনির্দেশ নিয়ে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।]

ভূমিকা : যুগের আবর্তন ও মানুষের জীবনাচারের পরিবর্তন মহান আল্লাহর অন্যতম অনুপম নিদর্শন। এ কারণে প্রত্যেক যুগের মানুষের জীবনযাত্রা, এর পদ্ধতি, ধরন ও উপকরণের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। মানুষের বস্তুতান্ত্রিক জীবনের উৎকর্ষতার ফলে প্রতি নিয়ত আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। আজ যে বিষয়টি নতুন, আগামী কাল তা পুরাতন। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্পনাতীত অগ্রগতি বর্তমান যুগকে অন্য সব যুগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করেছে। এসব আবিষ্কার মানুষের নানামুখি কর্মকাণ্ড সম্পাদন ও বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণকে সহজিকরণের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছে। ফলে তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এমনকি এসব নতুন নতুন বিষয়কে উপেক্ষার কল্পনাও বর্তমান সময়ে অসম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছে।

মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ছুঁয়ে যাওয়া এসব নতুন বিষয়ের শরঈ বিধান জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষত এ কারণে যে, পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে এসব বিষয়ের শরঈ বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই। ফলে বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্নে মুসলিমগণ

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা।

এসব বিষয়ের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য উপযোগী একমাত্র জীবনব্যবস্থা। কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হবে তার বিধান এ ব্যবস্থায় বর্তমান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ এমন অনেক বিষয়ের সম্মুখিন হয় যার কোন বিধান সরাসরি এতে পাওয়া যাচ্ছে না। নবুওয়ত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্ত হওয়ায় ওহীর মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তবে ওহীভিত্তিক এমন পদ্ধতি অবশিষ্ট রয়েছে যার মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের যে কোন নতুন বিষয়ের সমাধান সম্ভব।

পৃথিবীর প্রতিটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি থাকে। একইভাবে ওহীভিত্তিক উক্ত পদ্ধতির আলোকে সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনেরও নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে আইন গবেষককে কাঙ্ক্ষিত বিধান নির্ণয়ের পথ চলতে হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই নীতিমালাকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক হিসেবে সাম্প্রতিক বিষয়ের আরবী পরিভাষা, এর গুরুত্ব, এক্ষেত্রে আইন গবেষকের জন্য করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে মহানবী স., সাহাবী ও তাবিঈগণ কীভাবে সাম্প্রতিক সমস্যার আইনী সমাধান করতেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিষয় বলতে কী বুঝায়?

সাম্প্রতিক বিষয় বলতে এমন বিষয়কে বুঝায় যার ইসলামী বিধান নির্ণয়ের দাবি রাখে। অর্থাৎ, এমন বিষয় যার শরঈ বিধান বর্ণনার জন্য ফাতওয়া ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। তাই উক্ত বিষয়টি একেবারেই বিরল হোক বা পুরাতন বিষয় নতুন আঙ্গিকে আসুক অথবা নতুন হোক। সাম্প্রতিক বিষয়ের সংগায় আমরা কয়েকজন মনীষীর অভিমত উল্লেখ করতে পারি–

* প্রফেসর আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, "এটি এমন অবস্থা ও বিষয় ইসলামী ফিকহের আলোকে যার বিধান বিশ্লেষণের দাবি রাখে।"[১]
* শায়খ সালমান আওদাহ বলেন, "এমন নতুন বিষয় যার অধিকংশ দিক আধুনিক যুগের অনুগামী যার শরঈ বিধান জটিলতা ও দুর্বোধ্যতায় আচ্ছাদিত।"[২]

---

১. ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল আযীয, *ফিকহুন নাওয়াযিল, মাজাল্লাতু দাওয়াতুল হক*, মরক্কো: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংখ্যা-২৪, ১৪০২ হি. পৃ. ৪২
القضايا و الوقائع التي يفصل فيها القضاء طبقا للفقه الإسلامي

২. আল-আওদাহ, সালমান ইবনে ফাহাদ, *জাওয়াবিতুত দিরাসাত আল-ফিকহিয়্যাহ*, রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১৪১২ হি. পৃ. ৮৯ قضايا مستجدة يغلب على معظمها طابع العصر المتميز بالتعقيد و التشابك

* আল-বারযালীর 'জামিউ মাসাঈলিল আহকাম' গ্রন্থ পর্যালচনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে, "এটি আকীদা ও চরিত্র সংক্রান্ত এমন সমস্যা যা একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলত তিনি ইসলামী নীতিমালার আলোকে এর উপযুক্ত সমাধান ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রচেষ্টা করছেন।"[৩]

* ড. হাসান ফিলানী বলেন, "কোন ব্যক্তির উপর এমন কোন অবস্থা আপতিত হওয়া যাতে ঐ ব্যক্তি এ বিষয়ের শরঈ বিধান জানার জন্য যে ব্যক্তি তা অবগত করাতে পারেন তার শরণাপন্ন হন। তাই উক্ত বিষয় ইবাদত বা লেনদেন বা আচরণ বা চারিত্রিক যে বিষয়েই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন।"[৪]

অতএব সাম্প্রতিক বিষয় বলতে এমন নতুন বিষয়কে বুঝায় যার বিধানের ব্যাপারে শরীআতে সরাসরি কোন নস বর্ণিত হয়নি এবং সর্বসম্মত কোন ইজতিহাদ হয়নি।

সমার্থক কিছু আরবী পরিভাষা

সাম্প্রতিক বিষয় ও এ সংক্রান্ত ইসলামী বিধান বুঝাতে আরবী কিছু পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ পরিভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. হাওয়াদিস (حوادث) : শব্দটি হাদীসাহ (حادثة) এর বহুবচন। নতুন কিছু ঘটাকে হাদাসা (حدث) বলে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসাহ অর্থ– নতুন বিষয়। এজন্য বছরের শুরুতে নতুন বৃষ্টিকে হাদিসাহ বলে।[৫] আর এ সংক্রান্ত ফিক্‌হকে বলা হয় ফিকহুল-হাওয়াদিস (فقه الحوادث)।

২. আন্-নাওয়াযিল (النوازل) : এ শব্দটিও বহুবচন, একবচন নাযিলাহ (نازلة)। এর অর্থ বর্ণনায় আল-জাওহারী বলেন, সময়ের কোন কষ্টকর বিষয় যা জনসাধারণের উপর পতিত হয়। এ সংক্রান্ত ফিক্‌হকে বলা হয় ফিক্‌হুন নাওয়াযিল (فقه النوازل)।[৬]

---

৩. আল-বারযালী, *মুনাকাশাহ আলা জামি মাসাঈলিল আহকাম*, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব ওয়াল উলূমিল ইনসানিয়্যাহ*, রাবাতঃ মুহাম্মদ আল-খামিস বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৫ও ৬, ১৯৭৯, পৃ. ১৭২
(مشكلة عقائدية أو أخلاقية يصطدم بها المسلم في حياته اليومية فيحاول أن يجد لها حلا يتلائم و قيم المجتمع بناء على قواعد شرعية

৪. ফিলানী, ডক্টর হাসান, *ফিকহুন নাওয়াযিল*, রিয়াদঃ মুনতাকা আল-কীরওয়ান, হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে মালিকী মাযহাবের সম্প্রসার শীর্ষক প্রতিবেদন, ১৪১৪ হি., পৃ. ৩২০
(الواقعة و الحادثة التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك و الأخلاق حيث يلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرع في نازلته.)

৫. ইবনে মানযুর, জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪১০ হি, খ. ২, পৃ. ১৩২

৬. আল-জাওহারী, ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ, *আস্‌সিহাহ ফীল লুগাত*, বিশ্লেষণঃ আহমদ আব্দুল গফূর আতা, বৈরূত : মাকতাবাতুর রিসালাহ, খ. ৫, পৃ. ১৮২৯

৩. আল-অকায়িই (الوقائع) : শব্দটি অকিয়াহ (الواقعة) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ ঘটনা। লিসানুল আরব গ্রন্থকারের মতে, দুর্যোগ ও সময়ের দুর্বিপাক বুঝানোর জন্যও অকিয়াহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৭] এ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত করে এ সংক্রান্ত ফিক্হকে বলা হয় ফিকহুল অকিই (فقه الواقع)।

৪. মুসতাজিদ্দাহ (مستجدة) : শব্দটি জুদুদ (جدد) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ– নতুন। আর মুসতাজিদ্দাহ অর্থ– সাম্প্রতিক, সর্বশেষ অবস্থা, নতুন নতুন অবস্থা।[৮] আর এ সংক্রান্ত ফিক্হকে বলা হয় ফিকহুল-মুসতাজিদ্দাহ (فقه المستجدة)।

৫. কাদায়া মুআসিরাহ (قضايا معاصرة) : কাদায়া শব্দটি কাদিয়াহ (قضية) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ অমীমাংসিত বিষয়। যে অমীমাংসিত বিষয় ফয়সালার জন্য কাযী বা বিচারকের সম্মুখে পেশ করা হয় তাকে কাদিয়াহ বা মামলা বলা হয়।[৯] আর মুআসিরাহ শব্দটি আসর (عصر) শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সমসাময়িক, সমকালীন।[১০] অতএব কাদায়া মুআসিরাহ অর্থ সমকালীন অমীমাংসিত বিষয়। ফিক্হের সাথে সম্পৃক্ত করে একে বলা হয় কাদায়া মুআসিরাহ ফিকহিয়্যাহ (قضايا معاصرة فقهية)। যেসব সাম্প্রতিক বিষয়ের শরঈ বিধান নির্ণিত হয়নি সেসব বিষয়কে বুঝাতে বর্তমানে এই পরিভাষাটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের গুরুত্ব

বিভিন্ন কারণে সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের ইসলামী বিধান নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংগে এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচিত হল–

ক. ইসলামের গতিশীলতা ও পূর্ণতা প্রমাণ করা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এ পূর্ণতার ঘোষণা এসেছে।[১১] একই সাথে এ ব্যবস্থা শাশ্বত ও গতিশীল। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রতিটি মানুষ স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি ভেদে যে অবস্থার মুখোমুখী হোক না

---

৭. ইবনে, মানযুর, জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪০৩

৮. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৯৩৬

৯. আল-ফাইয়ূমী, আহমদ মুহাম্মদ, *আল-মিসবাহ আল-মুনীর*, বৈরূত : মাকতাবাহ আসরিয়্যাহ, ১৩১৮ হি. খ. ২, পৃ. ৬৯৬

১০. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৯৬৬

১১. আল-কুরআন, ৫ : ৩

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

মহান আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে নির্ধারিত করলাম"

কেন সে ক্ষেত্রে ইসলামের একটি নির্দেশনা থাকতে হবেই। নতুবা এটি হয়তো অপূর্ণাঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হবে অথবা যুগের উৎকর্ষতার বিপরীতে এটি অনুপযোগী হিসেবে প্রমাণিত হবে। অতএব নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের বিধান নির্ণয়ের মাধ্যমে একদিকে ইসলামের গতিশীলতা ও পূর্ণতা প্রমাণ করা ও অন্যদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তি যারা আধুনিক যুগে ইসলামের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তাদের প্রতিউত্তর প্রদান করা সম্ভব হয়।

খ. মুসলিম উম্মাহ'র কষ্ট লাঘব করা

এমন অনেক নতুন বিষয় সৃষ্টি হয় যার বিধান নির্ণিত না থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহ কষ্টের সম্মুখীন হন। আবার দেখা যায় অমুসলিমরা নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে অতিক্রম করে, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়। তাদের এ কষ্ট দূর করার জন্য ঐসব বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয় করার কোন বিকল্প নেই। যদি উক্ত বিষয় বৈধ হয় তাহলে মুসলমানগণ তা গ্রহণ করতে পারবেন। আর অবৈধ হলে এর বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রতি সচেষ্ট হবেন এবং উক্ত অবৈধ পদ্ধতি বর্জন করবেন।

গ. ইজতিহাদের ধারা চলমান রাখা

ইজতিহাদ তথা ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের গবেষণা একদল মানুষের জন্য অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দীনের জ্ঞান লাভ করে"।[১২] ইজতিহাদের মূল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে নতুন নতুন বিষয় গবেষণা করে এর বিধান উদ্ভাবন করা। যাকে আমরা ইস্তিখরাজ (استخراج), ইস্তিম্বাত (استنباط) ইত্যাদি নামে চিনি। অতএব এ বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে ইজতিহাদের ধারা চলমান রাখা জরুরী।

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনে করণীয়

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনে ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ থেকে এখানে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হলো–

১. বিধান নির্ণয়ের পূর্বে করণীয়
২. বিধান উদ্ভাবনের সময় করণীয়
৩. শরীআহ অভিযোজন (Shariah Adaptation)
৪. সম্মিলিত গবেষণা (Group Ijtihad)

১. বিধান নির্ণয়ের পূর্বে করণীয়

সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গবেষকের যেসব করণীয় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

---

১২. আল-কুরআন, ৯ ঃ ১২২ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

ক. ঘটনার বাস্তবতা নিশ্চিত হওয়া

অবাস্তব বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান তলব ও প্রদান করা সালফে সালিহীন অপসন্দ করতেন। ইবনে উমর রা.-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যে বিষয়ের কোন বাস্তবতা নেই সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। কেননা আমি উমর ইবনুল খাত্তাব কর্তৃক ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে শুনেছি যে ব্যক্তি অবাস্তব বিষয়ে প্রশ্ন করে।[১৩]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাহাবীগণের চেয়ে উত্তম মানব গোষ্ঠী আমি দেখিনি। তাঁরা তাঁর কাছে তেরটি প্রশ্ন ছাড়া কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর এর সবগুলোই কুরআনে বিধৃত হয়েছে। তাঁদের উপকারে আসত এমন বিষয় ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতেন না।[১৪]

খ. বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য হওয়া

গবেষককে দৃষ্টি দিতে হবে উদ্ভূত পরিস্থিতি আদৌ বিশ্লেষণের যোগ্য কি না? কেননা এমন অনেক বিষয় আছে যাতে মানুষের দীন-দুনিয়ার কোন কল্যাণ নেই। অযথা এর পিছনে সময় ও মেধা খরচ করা উচিত নয়। যদি কেউ কোন আলিম বা মুফতীকে বিপদে ফেলানোর জন্য বা তাকে অসম্মান করার জন্য অথবা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের বিধান জানতে চায় তবে তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কেননা মহানবী স. কুটিল প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫]

একইভাবে যেসব বিষয়ে শরীয়তের নস রয়েছে সেসব বিষয়ে ইজতিহাদ না করা। কেননা ফিকহী মূলনীতি হল, لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "নস থাকলে সেখানে ইজতিহাদের অনুমতি নেই।"[১৬]

---

১৩. আদ্‌দারিমী, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান, *সুনান আদ্‌দারিমী*, বিশ্লেষণঃ ফাওয়ায আহমদ আয্‌যামরালী ও খালিদ আস্‌সাবআ, বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি, বাবু কারাহিয়্যাতুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ৬২

جاء رجل يوما إلى بن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو فقال له بن عمر لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن

১৪. আদ্‌দারিমী, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান, *সুনান আদ্‌দারিমী*, প্রাগুক্ত, বাবু কারাহিয়্যাতুল ফাতওয়া, খ. ১, পৃ. ৬৩

ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن

১৫. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআস, *আস্‌সুনান*, বিশ্লেষণঃ মুহাম্মদ আওয়ামাহ, মক্কাঃ আল-মাকতাবাহ মাক্কীআহ, ১ম প্রকাশ-১৪১৯ হি, অধ্যায় : আল-ইলম, বাবুত অনুচ্ছেদ : তাওয়াক্কী ফীল ফাতওয়া, খ. ৪, পৃ. ২৪৩ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْغَلُوطَاتِ

১৬. যারকা, আহমদ, *শারহু কাওয়াঈদুল ফিকহিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারুল কালাম, ১৪০৯ হি, পৃ. ১৪৭

সাম্প্রতিক যেসব বিষয় বিশ্লেষণযোগ্য তা হল[১৭]–

১. যে বিষয়ে কোন অকাট্য দলীল বা ইজমা থাকবে না।

২. যদি উক্ত বিষয়ে অকাট্য দলীল থাকে তবে সে দলীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তথা তাবিলের পর্যায়ভুক্ত হতে হবে।

৩. এমন মতবিরোধপূর্ণ বিষয় যার ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে যেয়ে একপক্ষ তাকে বৈধ বলেছেন অন্যপক্ষ তাকে অবৈধ বলেছেন।

৪. বিষয়টি আকীদা বা তাওহীদের মূলনীতি কিংবা কুরআন-সুন্নাহ'র মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৫. বিষয়টি এমন সাম্প্রতিক সমস্যা যা ইতোমধ্যে সমাজে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে বা এমন অবশ্যম্ভাবী যার শরঈ বিধান আবশ্যক।

গ. সূক্ষ্ম অনুধাবন

সাম্প্রতিকতার ফিক্হ তথা আধুনিক বিষয়ের ইসলামী সমাধান অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়। এ এমন এক জিজ্ঞাসা যে সম্পর্কে সরাসরি কোন বিধান বর্ণিত নেই। এ জন্য এ বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের পূর্বে এর খুঁটিনাটি সব কিছু ভালভাবে অনুধাবন অপরিহার্য। খলিফা উমর রা. কর্তৃক আবূ মূসা আশয়ারী রা.-কে লেখা পত্রে তিনি বলেন–

"নিশ্চয় বিচার-ফয়সালা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা প্রত্যেক যুগে চলে আসছে। তোমার কাছে কোন মামলা আসলে তা ভালভাবে অনুধাবন করবে (অতঃপর তা কার্যকর করবে)। কেননা মৌখিক ফয়সালার কোন অর্থ হয় না, যতক্ষণ না তা কার্যকর হয়। যেসব মামলার ফয়সালা কুরআন ও হাদীসে না পাওয়া যাবে সেগুলোকে খুব গভীরভাবে অনুধাবন করবে।"[১৮]

ঘ. প্রাজ্ঞজনের পরামর্শ গ্রহণ

আধুনিক বিষয়টি সম্পর্কে প্রাজ্ঞজনের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নির্দেশও রয়েছে: "জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।"[১৯] শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে বর্তমান সময়ে একজন আলিমের পক্ষে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ব্যবসায় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যথার্থভাবে জানার সুযোগ নেই। এজন্যই উদ্ভূত

---

১৭. জাস্‌সাস, আবু বকর, *আল-ফুসুল ফীল উসূল*, বিশ্লেষণ: ড. আজীল নাশমী, কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪১৪ হি, খ. ৪, পৃ. ১৩; ইবনে কাইয়্যিম, *ইলামুল মুকিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন*, লেবানন: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি, খ. ১, পৃ. ৫৪-৫৬; আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন, *আল-আহকাম ফী তাময়িযুল ফাতাওয়া আনিল আহকাম*, বিশ্লেষণ: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, হালব: মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ- ১৪১৬ হি, পৃ. ১৯২

১৮. ফারিক, খুরশীদ আহমদ, *হযরত উমর রা.-এর সরকারী পত্রাবলি*, অনুবাদ: মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ- ২১৮-২১৯

১৯. আল-কুরআন, ২১ : ৭, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যাবতীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রাজ্ঞজনের কাছ থেকে ভালভাবে অবগত হওয়া কর্তব্য। যেমন– কেউ যদি টেস্ট টিউব বেবী, জরায়ু ভাড়াদান, মরণোত্তর অঙ্গদান, শেয়ার মার্কেট, ব্যাংক কার্ড ইত্যাদি বিষয়ের বিধান নির্ণয় করতে চান তবে নিশ্চয় তাকে এসবের প্রক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক সব বিষয় সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে জানতে হবে।

ঙ. মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা

বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন তার জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করা অবশ্য কর্তব্য। আমরা কোনভাবেই এ আত্মিক দিককে অবহেলা করতে পারি না। মহান আল্লাহ্ ফিরিশতাদের ঘটনা বর্ণনা করে এ সংক্রান্ত আদব আমাদেরকে শিখিয়েছেন। নিজের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে বলতে বলেছেন: "আপনার পবিত্রতা, আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তার চেয়ে বেশি কোন জ্ঞান আমাদের নেই।"[২০] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, "বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"[২১]

২. বিধান উদ্ভাবনের সময়ে করণীয়

সমসাময়িক সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গবেষকের যেসব করণীয় তা হল–

ক. দলীল, প্রস্তাব ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা

১. বিধানের দলীল বর্ণনা করা: ইমাম ইবনে কাইয়্যিম বলেন, মুফতী বা মুজতাহিদের উচিত বিধানের দলীল ও সূত্র বর্ণনা করা এবং ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারীকে দলীলবিহীন উত্তর না দেয়া।[২২]

২. বিকল্প প্রস্তাবনা পেশ করা : যেহেতু সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অধিকাংশই অমুসলিম কর্তৃক উদ্ভাবিত সেহেতু মুসলিম গবেষকের উচিত এসব বিষয়ের যে যে দিক শরীআহ'র সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো পরিত্যাগ করে এর বিকল্প পদ্ধতি বের করা। ইমাম ইবনে কাইয়্যিম বলেন, মুফতী বা মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক যদি তিনি ফাতওয়া তলবকারী তথা সমাধান প্রত্যাশীদেরকে কোন কাজ থেকে নিষেধ করেন অথচ বিষয়টি তার জন্য অতি জরুরী তবে তিনি তাকে বা তাদেরকে উক্ত কাজের বিকল্প পথ বলে দিবেন। যাতে উক্ত ব্যক্তির জন্য হারামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ও শরীআহ অনুমোদিত পদ্ধতির দরজা উন্মুক্ত থাকে।[২৩]

---

২০. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩২, سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
২১. আল-কুরআন, ২০ ঃ ১১৪, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
২২. *ইবনে কাইয়্যিম, ইলামুল মুয়াক্কিঈন আন-রাব্বিল আলামীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩
২৩. প্রাগুক্ত

৩. বিধান বর্ণনার পূর্বে প্রেক্ষাপট বর্ণনা : সাম্প্রতিক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিধান বর্ণনার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ উক্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে হবে, যাতে উক্ত বিষয়ের বিধান মানুষ সহজে বুঝতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ যাকারিয়া আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, বার্ধক্যের এমন পর্যায়ে তাঁর সন্তান হয়েছিল যে পর্যায়ে সাধারণত সন্তান হয় না। মহান আল্লাহ এঘটনাটি ঈসা আ.-এর পিতা ছাড়া জন্ম হওয়ার ঘটনা বর্ণনার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যাতে অতিশয় বৃদ্ধ দম্পতি থেকে সন্তান জন্ম নেয়ার ঘটনা বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে পিতা ছাড়া সন্তান জন্ম হওয়ার ঘটনা বিশ্বাস করা সহজ হয়।[২৪]

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাথে সাথে সম্পূরক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করাও মুজতাহিদের কর্তব্য। ইমাম বুখারী র. তার সহীহ বুখারীতে "মান আজাবাস সাঈল বিআকসারি মিম্মা সাআলাহু আনহু" শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছেন মহানবী স. অনেক প্রশ্নের জবাবের সাথে সাথে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছেন।

খ. মাকাসিদে শরীআহ'র প্রতি দৃষ্টি রাখা

মাকাসিদে শরীআহ বলা হয়, বান্দার কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যেসব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে সেসব উদ্দেশ্যকে। সাম্প্রতিক বিষয় পর্যাবেক্ষণকারী গবেষকের জন্য মাকাসিদে শরীআহ'র গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক এখানে উল্লেখ করা হল[২৫]-

১. কল্যাণ নিশ্চিত করা।
২. কষ্ট দূরীভূত করার নীতি বাস্তবায়ন করা।
৩. ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা।

গ. সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কিত বর্তমান কোন বিধান থাকলে তার বিশ্লেষণ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য গবেষক সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের সময় এ সংক্রান্ত কোন গবেষণাপ্রসূত বিধান আছে কি না এবং সে বিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না তা দেখবেন। লক্ষ করবেন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উক্ত বিধান পরিবর্তনযোগ্য কি না? কেননা শরীয়াতের ইজতিহাদপ্রসূত অনেক বিধান স্থান-কাল-সমাজ পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে একই মাযহাবের মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীনের মধ্যে ফাতওয়ার ভিন্নতা দেখা যায়। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামী আইনের মূলনীতি শাস্ত্রের সূত্র রয়েছে: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان। "যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন স্বীকৃত।"[২৬]

---

২৪. সূরা মারইয়ামে (আল-কুরআন: ১৯) এ সংক্রান্ত আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।
২৫. আল-গাযালী, আবু হামিদ, *আল-মুসতাসফা*, সিরিয়া: আল-মাতবাআহ আল-আমীরিয়্যাহ, ১৩২২ হি, খ. ১, পৃ. ২৯৬
২৬. যারকা, শেখ আহমদ, *আল-কাওয়াঈদ আল-ফিকহিয়্যাহ*, তা. বি. পৃ. ২২৭

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম তাঁর ইলামুল মুয়াক্কিয়ীনের মধ্যে تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ঘ. সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের প্রতি দৃষ্টিদান

ফকীহগণ ইসলামী আইন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথা ও প্রচলনকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছেন, যার দৃষ্টান্ত অসংখ্য যেমন– রজঃস্রাব ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময়কাল, গর্ভধারণের মেয়াদ, যেসব অপবিত্রতাকে ক্ষমা করা হয়েছে, শপথ, অঙ্গীকার, অসীয়াত ইত্যাদি। ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথার গুরুত্ব প্রমাণিত হয় ফিকহী মূলনীতি العادة محكمة 'রীতি ও বিবেচ্য বিধান' থেকে; যা মূলত ইবনে মাসউদ রা.-এর উক্তি– "মুসলমানগণ যা ভাল মনে করেন আল্লাহর কাছেও তা ভাল। আর তারা যা খারাপ মনে করেন তা আল্লাহর কাছেও খারাপ"[২৭] এর আলোকে প্রণীত। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ ৪টি বিশেষ শর্ত প্রদান করেছেন:[২৮]

১. সামাজিক প্রথাটি ব্যাপক সমাদৃত থাকা।
২. প্রথাটি প্রচলনের শুরু থেকে অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় থাকা।
৩. উক্ত প্রথার বিপরীতে ভিন্ন কোন প্রথা চালু না থাকা।
৪. প্রথাটি শরীয়াতের স্পষ্ট বিধান বিরোধী না হওয়া।

৩. শরীআহ অভিযোজন (Shariah Adaptation)

শরীআহ অভিযোজন বর্তমান সময়ে ব্যাপক ব্যবহৃত একটি ফিকহী পরিভাষা। প্রাচীন ফিক্হের কিতাবে এ পরিভাষার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তবে কাছাকাছি কিছু পরিভাষা আছে, আধুনিক সময়ে আলিমগণ বিভিন্নভাবে এই পরিভাষাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন।

* ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, শরীআহ অভিযোজন অর্থ উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর শরঈ নস প্রয়োগ।[২৯]
* কোন মাসআলার শরীআহ অভিযোজন অর্থ উক্ত মাসআলাটিকে (শরীআহ বিরোধী বিধান থেকে) মুক্তকরণ ও তাকে নির্দিষ্ট গণ্য দলীলের সাথে সম্পৃক্তকরণ।[৩০]

---

২৭. ইবনে হাম্বল, আহমদ, ইমাম, *আল-মুসনাদ*, বিশ্লেষণ: শুয়াইব আরনোট ও অন্যান্য, বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি, পৃ. ৮৪,
فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ

২৮. ইবনে নুজাইম, যয়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মতিই আল-হাফিজ, দামিশক: দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি, পৃ. ১১০-১১৪
সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি, পৃ. ১৯২-১৯৩

২৯. কারযাভী, ড. ইউসুফ আব্দুল্লাহ, *আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াত তাসঈব*, কুয়েত: দারুল কালাম, ১৪০২ হি, পৃ.৭২

৩০. কুলআহ, ড. মুহাম্মদ রিওয়াস ও কুনাইবী, ড. হামিদ সাদিক, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরূত: দারুন্ নাফাইস, ১৪০৮ হি, পৃ. ১৪৩

এক কথায়, সাম্প্রতিক কোন বিষয়কে শরীআহ'র রঙে রঙিন করাকে বলা হয় শরীআহ অভিযোজন। অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে শরীআহ'র সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নেই তাকে শরীআহ'র বিধানের সাথে খাপ খাওয়ানো বা শরীয়াতের বিধানের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপন।

শরীআহ অভিযোজনের গুরুত্ব

আধুনিক সময়ের ফকীহগণের নিকট দুটি কারণে শরীআহ অভিযোজন শব্দটি বিশেষ গুরুত্বহ।

প্রথমত, সাম্প্রতিক বিষয়গুলো সমকালীন সর্বশেষ অবস্থাসমৃদ্ধ। পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে যে সম্পর্কে কোন আলোচনা বিদ্যমান নেই। আবার বিষয়গুলো জটিল, দুর্বোধ্য অথচ জীবনঘনিষ্ঠ। এ কারণে এর বিধান নির্ণয় কষ্টসাধ্য। কেননা এক্ষেত্রে দীর্ঘ পথপরিক্রমা প্রয়োজন। অতএব শরীআহ অভিযোজন উক্ত পরিক্রমার একটি পদক্ষেপ ও পর্যায়।[৩১]

দ্বিতীয়ত, বিগত কয়েক যুগে সভ্যতার উন্নতি ও সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। এসব উন্নতি ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যেসব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কিত বিধান গবেষণা করার মত 'মুজতাহিদ মুতলাক' (স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী শরীআগ উদ্ভাবক) এর অভাব এবং মাযহাবী মুজতাহিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে শরীআহ অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সাম্প্রতিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, এর গুণাগুণ বিবেচনা ও তাকে রূপায়নের ক্ষেত্রে এর স্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

শরীআহ অভিযোজনের সময় লক্ষণীয়

ক. শরীআহ অভিযোজন শরীআহ'র মূলনীতির ভিত্তিতে শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হতে হবে। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিকটতম মূলনীতির মাধ্যমে অভিযোজন করা যাতে ঐ মূলনীতির বিধানকে উক্ত বিষয়ের বিধান হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এতে কোন জটিলতা নেই। বরং জটিলতা তখনই দেখা দেবে যদি অসামঞ্জস্য মূলনীতির মাধ্যমে অভিযোজন করা হয়।

খ. পরিস্থিতিকে শুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ রূপায়নের জন্য সাধনা করা। বিষয়টি গবেষক, বিচারক ও আইন বিশ্লেষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন কিছুর বিধান উক্ত বিষয়ের রূপায়ণেরই একটি অংশ। অতএব যে ব্যক্তি সাম্প্রতিক বিষয় রূপায়ণ করবে তার উচিত এর পূর্ণ ও শুদ্ধ রূপায়ণ করা এবং এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা, শাখা-প্রশাখা, মূলনীতি ইত্যাদি অবগত হওয়া।

---

৩১. আল-আওদাহ্, সালমান ইবনে ফাহাদ, *জাওয়াবিতুত দিরাসাত আল-ফিকহিয়্যাহ,* তা. বি. পৃ. ৮৯

গ. মুজতাহিদকে মাসআলা উপস্থাপন ও মূলনীতির সাথে একীভূতকরণের ফিকহী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।[৩২]

৪. সম্মিলিত ইজতিহাদ

ইসলামী আইন গবেষণার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদ একটি নতুন মাত্রা। ইসলামের প্রাথমিক যুগসমূহে মুসলিম পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের পারদর্শিতার ফলে ব্যক্তিগত বা একক গবেষণার মাধ্যমে সফলতার সাথে তৎকালীন বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয় সম্ভব হলেও বর্তমান সময়ে তা কষ্টসাধ্য। কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ'র দুর্বল অবস্থানের কারণে শেষের শতাব্দীগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার সেই সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। যার প্রেক্ষিতে সঠিক ইজতিহাদ করার মত প্রজ্ঞাবান আলিম এর ব্যাপক অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে বর্তমানে একক গবেষণায় সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষকের অভাব মুসলিম বিশ্বের প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চিন্তা-চেতনার জগতে বিরাট বিপ্লব সাধিত হওয়ায় জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন দিক নিয়ে ইজতিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ সম্মিলিত ইজতিহাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

সম্মিলিত ইজতিহাদ কী?

সম্মিলিত ইজতিহাদ একটি আধুনিক ফিকহী পরিভাষা। পূর্ববর্তী উসূলের কিতাবসমূহে এ বিষয়ক স্বতন্ত্র কোন অধ্যায় পাওয়া যায় না। সম্মিলিত ইজতিহাদের পরিচয়ের জন্য ইজতিহাদের সংজ্ঞা অবশ্যক। বিভিন্ন গ্রন্থে ইজতিহাদের অসংখ্য সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা ইমাম ফাতুহী র.-এর সংজ্ঞাটিকে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য সাব্যস্ত করতে পারি। তিনি বলেন, "কোন বিষয়ের শরঈ বিধান অর্জনের জন্য ফকীহ কর্তৃক তার শক্তি ব্যয় করা।"[৩৩]

---

৩২. কাহতানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ আল-আহকাম আল-ফিকহিয়্যাহ লিন নাওয়াযিল আল-মুআসারাহ*, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩৯৭-৪০৪ (সংক্ষেপিত)

৩৩. ফাতুহী, ইব্‌ন নায্‌যার, *শারহু আল-কাওকাব আল-মুনীর*, বিশ্লেষণ: ড. মুহাম্মদ আল-যুহাইলী ও ড. নাযিয়াহ আল-হাম্মাদ, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৩ হি, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮
استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي

বর্তমান সময়ের কেউ কেউ সামষ্টিক ইজতিহাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন–

* ড. আব্দুল মাজীদ শারফী বলেন, বিধান উদ্ঘাটনের পদ্ধতির আলোকে কোন বিষয়ের শরঈ বিধান সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ কর্তৃক চেষ্টা সাধনা এবং পরামর্শের পর উক্ত বিধানের উপর তাদের সকলের বা অধিকাংশের ঐকমত্য।[৩৪]
* ড. আল-আব্দু খলীল বলেন, কোন বিষয়ের শরঈ বিধানের উপর কোন যুগের উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুজতাহিদের ঐক্যমত।[৩৫]

প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত ইজতিহাদ হচ্ছে– কোন বিষয়ের শরঈ বিধান নির্ণয়ের জন্য একদল আলিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক পরামর্শ ও পর্যালোচনান্তে উক্ত বিষয়ের উপর ঐকমত্য স্থাপন করাকে সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা হয়। যেমন ইসলামিক ফিকহ একাডেমী জিদ্দায় করা হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব

এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোন বিষয়ে একক কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও মতামতের চেয়ে উক্ত বিষয়ে একদল মানুষের চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়ক। তা ছাড়া পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সঠিক বিষয়টিই বেরিয়ে আসা স্বাভাবিক। এ কারণেই শূরা (পরামর্শ) থেকে নির্গত ফলাফল অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "সকল কাজে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।"[৩৬]

যেসব কারণে বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদ গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে–

ক. একক গবেষণার তুলনায় সম্মিলিত গবেষণা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা সমকালীন বড় বড় আলিম, গবেষক, বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে সামগ্রিক দিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মিলিত ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়।

খ. সম্মিলিত ইজতিহাদ ইজতিহাদকে চলমান রাখে এবং তা বন্ধ হওয়া রোধ করে। ইজতিহাদ ইসলামী আইনের একটি মৌলিক বিষয় ও ইসলামের গতিশীলতা প্রমাণের প্রধান অবলম্বন।

---

৩৪. শারফী, ড. আব্দুল মাজীদ, *আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ফীত তাশরীঈ আল-ইসলামী*, মক্কা: কুতুবুল উম্মাহ সিরিজ-৬২, ১৪১৮ হি, পৃ. ৪৬ استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط و اتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور

৩৫. খলীল, ড. আল-আব্দু, *আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ফী হাজাল আসর*, জর্ডান: জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সংখ্যা-১০, ১৯৮৭, পৃ. ২১৫
اتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة

৩৬. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

গ. সম্মিলিত ইজতিহাদ মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের পথ সুগম করে। কারণ মুসলিম উম্মাহ'র আলিমগণ একত্রীত হয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়। আর জনসাধারণ তাদের নির্ণীত বিধানের সাথে একমত হয়ে অনুসরণ করেন। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য ফুটে ওঠে।

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করে ড. ইউসূফ আল-কারযাভী বলেন, আধুনিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতিহাদকে সামষ্টিক ইজতিহাদে উন্নীত করতে হবে। যে পদ্ধতিতে আলিমগণ উক্ত উত্থাপিত বিষয়ে বিশেষত সাধারণ জনগণ যার অনুসরণ করবে সে বিষয়ে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করবেন। নিশ্চয় একক মতামতের চেয়ে একদল মানুষের চিন্তা-গবেষণা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর উপযোগী।[৩৭]

ড. মুফসির কাহতানী তার গ্রন্থে শেখ মোস্তফা আল-যারকাহ্ এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, অতীতে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে তা বরং ক্ষতিকর, যা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাযহাবের ফকীহগণ ইজতিহাদের দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র অবলম্বন ইজতিহাদ/এক্ষেত্রে আমাদেরকে ইজতিহাদের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আর তাহল ব্যক্তিগত ইজতিহাদের পরিবর্তে সম্মিলিত ইজতিহাদ এবং এর মাধ্যমে আমরা ইজতিহাদের প্রথম পথ চলা অর্থাৎ আবু বকর ও উমর রা-এর যুগে ফিরে যাব।[৩৮]

সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতি

সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতি অবগত হতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের ক্রমধারায় এ সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। ইসলামী আইনের প্রাথমিক যুগগুলোতে কীভাবে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হত নিম্নে সংক্ষেপে তা বিধৃত হল–

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে মহানবী স.-এর পদ্ধতি

মহানবী স.-এর সময়ে সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদান মূলত দুটি বিষয়নির্ভর ছিল।

১. ওহী মাতলু বা কুরআন : পবিত্র কুরআন সাধারণত সাম্প্রতিক অবস্থার বিশ্লেষণ, মুসলমানদের করণীয় বা তৎসংশ্লিষ্ট বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হতো, যাকে উক্ত অংশ অবতরণের কারণ বা 'শানে নুযূল' বলা হয়। অতএব কুরআন অবতরণের সময়কালে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির বিধান সরাসরি কুরআন থেকে পাওয়া যেত।

---

৩৭. আল-কারযাভী, ড. ইউসুফ আব্দুল্লাহ, *আল-ইজতিহাদ ফীশ শরীআহ আল-ইসলামিয়্যাহ,* কুয়েত: দারুল কলম, ১৪১০ হি, পৃ. ১৮২

৩৮. কাহতানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ,* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৮ (সংক্ষেপিত)।

২. ওহী গায়র মাতলু বা সুন্নাহ : যাকে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীমূলক, কর্মসূচক ও মৌনসম্মতিমূলক সুন্নাহ বলা হয়।[৩৯] সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে ওহী গায়র মাতলুর যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হত তার মধ্যে রয়েছে–

ক. রসূলুল্লাহ স. কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: "আপনার প্রতি আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় ব্যাখ্যা করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৪০] এ কারণে মহানবী স. কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করতেন, এর বিধান বাস্তবায়ন করতেন, এর আলোকে বিভিন্ন বিধান প্রয়োগ করতেন। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন বিধান রহিত করতেন।

খ. উদ্ভূত বিষয়ের বিধান তিনি নিজেই প্রদান করতেন। বিশেষত যেসব বিষয়ের কোন বিধান কুরআনে আসেনি। রসূলুল্লাহ স.-এর ঘোষিত বিধানের মধ্যে রয়েছে দাদীর উত্তরাধিকার, যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা, বিতরের সালাত ইত্যাদি।[৪১]

গ. উদ্ভূত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য মহানবী স. সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। যেমন- বদরের যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।[৪২]

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে সাহাবীগণের পদ্ধতি

মহানবী স-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ সাম্প্রতিক বিষয়ের সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র পাশাপাশি আরো কিছু নতুন পদ্ধতি যুক্ত করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. ইজমা বা সম্মিলিত ইজতিহাদ : সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি মহানবী স.-এর ইন্তিকালের পরপরই প্রয়োগ শুরু হয়। যার মাধ্যমে আবু বকর রা.-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। এ পদ্ধতির আলোকে সাহাবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিধান নির্ণয় করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে[৪৩]–

---

৩৯. ইবনে খালদুন, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ, *মুকাদ্দামাহ*, ব্যাখ্যা ও ভূমিকা: ড. মুহাম্মদ আল-ইসকিন্দারানী, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪১৭ হি, পৃ. ৪১৮-৪১৯

৪০. আল-কুরআন, ১৬ :৪৪ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

৪১. ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দামাহ*, প্রগুক্ত, পৃ. ৪১৮

৪২. মুসলিম, ইমাম, আস-*সহীহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল জিহাদ, জিহাদ ওয়াস সিয়ার, অনুচ্ছেদ : ইমদাদ বিল মালাইকাতি ফী গাযওয়াতে বদর, তা. বি. খ. ৫, পৃ. ১৫৬

৪৩. আল-মারাগী, আব্দুল্লাহ মুস্তফা, *আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাবাকাতিল উসূলিয়্যিন*, বৈরূত: মুহাম্মদ আমীন দামিজ, ১৩৯৪ হি, খ. ১, পৃ. ১৯, ২১

১. আবু বকর রা.-কে খলীফা নির্বাচন
২. কুরআন সংকলনের অপরিহার্যতা
৩. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
৪. মদ্যপের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ।

খ. কিয়াস : সাহাবীগণের যুগে এ পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বিধানের আলোকে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করা। বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীগণের কৃত কিয়াসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে যেয়ে অনেক উসূলবিদ তাদের গ্রন্থে এ সংক্রান্ত পৃথক অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন।[৪৪]

গ. সাহাবীগণের অভিমত : সাহাবীগণ বিশেষত উমর রা. অন্য সাহাবীগণের বাণীর ভিত্তিতে অনেক নতুন বিষয়ের সমাধান দিতেন। বর্ণিত আছে, তাঁর সামনে নতুন কোন বিষয় উপস্থাপিত হলে তিনি আগে দেখতেন এর বিধান কুরআন ও সুন্নাহ'য় রয়েছে কিনা। যদি না থাকত তবে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আবু বকর কি এ জাতীয় কোন বিষয় ফয়সালা করেছিলেন? যদি আবু বকর রা. কৃত এমন কোন ফয়সালা থাকত তবে তিনি তার অনুসরণ করতেন।[৪৫] এছাড়াও অনেক সাহাবীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যে, তাঁরা বড় বড় সাহাবীর মতামত অনুকরণ করে ফয়সালা করতেন।[৪৬]

এ যুগে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুটি নতুন বিষয়কে বিবেচনায় আনা হয়েছিল।[৪৭] আর তা হল, মাসালিহ মুরাসালাহ[৪৮] ও সাদ্দুজ জারাঈ[৪৯]।

---

৪৪. ইবনে কাইয়্যিম, *ইলামুল মুয়াক্কিইন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৩-২০৫, ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দামা*, প্রাগুক্ত

৪৫. বায়হাকী, আহমদ ইব্ন হুসাইন, *আস্-সুনান আল-কুবরা*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা, মক্কা: মাকতাবাহ্ দারুল বায, ১৪১৪ হি, অধ্যায় আদাবুল কাযী, অনুচ্ছেদ : মা ইকদী বিহিল কাযী ওয়া মা ইফতি বিহিল মুফতী, খ. ১০, পৃ. ১১৪

৪৬. ইবনে কাইয়্যিম, ইলামুল মুয়াক্কিইন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪-২২

৪৭. আল-কারাফী, শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস ইবনে ইদরীস, *শারহ্ তানকীহুল ফুসুল ফী ইখতিসারিল মাহসূল ফীল উসূল*, বিশ্লেষণ: তহা আব্দুর রউফ সায়াদ, কায়রো: দারুল ফিকর, ১৩৯৩ হি, পৃ. ৪৪৬।

৪৮. মাসালিহ মুরাসালা (مصالح مراسلة) বলা হয়, শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের অনুরূপ কার্য সম্পাদন যা গৃহীত বা বাতিলকৃত হওয়ার ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান পাওয়া যায় না। المصالح المراسلة هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي و لا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء আবু যাহরা, ইমাম মুহাম্মদ, *উসূল আল-ফিকহ*, আল-কাহেরা : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৫৭ পৃ. ২৬১

৪৯. যেসব উপায়-উপকরণ ক্ষতিকর ও শান্তিবিঘ্নকারী নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে প্রলুব্ধ করে সেসব কর্মের পথ রুদ্ধ করার নাম সাদ্দুজ জারাঈ। سد الذرائع هو كل ما يتوصل به إلى الشئ الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة আয-যুহায়লী, ড. ওহাবাহ, *উসূল আল-ফিক্হ*, দামিশক: দারুল ফিকর, ১৪০৬ হি, খ. ২, পৃ. ৮৭৪

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানে তাবিঈগণের পদ্ধতি

সাম্প্রতিক বিষয়ে সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে তাবিঈগণের যুগে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়নি। বরং তারা সাহাবীগণের পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন। তবে এ যুগে ইজতিহাদ ও কিয়াসের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুক্তি দর্শন ভিত্তিক এ পদ্ধতির গোড়াপত্তন মূলত ইবরাহীম নাখয়ীর হাতে হয়, যিনি আলকামা নাখয়ীর ছাত্র ছিলেন। আর আলকামা নাখয়ী সরাসরি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। সাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. অধিক হারে রায় ও কিয়াস প্রয়োগের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫০] এ সময়কালে যুক্তি ও দর্শন নির্ভর এ পদ্ধতি উদ্ভবের কারণ এ সময়ে ইসলামী সম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ইসলাম গ্রহণের ফলে অধিক হারে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় যার কোন সমাধান সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ বা পূর্বের আইনী উৎসে বিদ্যমান ছিল না। এ সময়ে ইরাক ছিল সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণেই ইসলামী বিধান নির্ণয়ের এ পদ্ধতিটিও এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।[৫১]

তাবিঈগণের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ তাবে-তাবিঈগণের যুগে এ বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালী অধ্যায় রচিত হয়। এই যুগেই প্রধান চার মাযহাবের প্রকাশ ও তাদের ফিক্‌হ সংকলন সম্পন্ন হয়।

ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল বর্তমান সময়ে এসে তাকে আমরা নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করতে পারিঃ

১. শরঈ দলীল (الأدلة الشرعية) : শরীয়তের দলীল
২. ফিকহী কায়িদা (القواعد الفقهية) : ফিকহের মূলনীতি
৩. তাখরীজ ফিকহী (التخريج الفقهي) : ফিকহী বিশ্লেষণ
৪. মাকাসিদ শরীআহ (المقاصد الشرعية) : শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য

১. শরঈ দলীলের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

শরঈ দলীল অর্থাৎ ইসলামী আইনের উৎস কয়টি সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম তুফী তার 'রিসালাহ ফী রিআয়াতুল মাসলাহা' গ্রন্থে ইসলামী আইনের ১৯টি উৎসের বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকর ড. আহমদ আবদুর রহীম সায়েঈ এছাড়া আরও ২৬টিসহ মোট ৪৫টি উৎসের উল্লেখ করেছেন।[৫২] ফকীহগণ শরীয়াতের দলীলসমূহ দু'ভাগে ভাগ করেছেন–

---

৫০. ইবনে কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০-৬১
৫১. ইবনে খালদুন, মুকাদ্দামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬
৫২. তুফী, ইমাম, *রিসালাহ ফী রিআয়াতুল মাসলাহা*, বিশ্লেষণঃ ড. আব্দুর রহমান সায়েঈ, বৈরূত : দারুল মিসরিয়্যাহ লিবনানিয়্যাহ, ১৪১৩ হি, পৃ. ১৩-২১

প্রথম ভাগ : যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণ একমত হয়েছেন। এর মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ, ব্যাপারে সকলেই একমত। জমহুর ফকীহগণ ইজমা ও কিয়াস শরীয়াতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত। মুতাযিলা মতাদর্শী নাজ্জাম ও খারিজীগণ ইজমা এবং জাফরিয়্যাহ ও জাহিরিয়্যাহ সম্প্রদায় কিয়াসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[৫৩]

দ্বিতীয় ভাগ : যেসব দলীলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, ইমাম কারাফী তার সংখ্যা বলেছেন ১৫। ড. আবদুর রহীম সায়েঈ এর বর্ণনা অনুযায়ী ৪১। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ও ফকীহগণের মতামতের ভিত্তিতে এর সংখ্যা দাড়ায় ৮ এ।

১. ইস্তিহসান, ২. ইস্তিসহাব, ৩. মাসালিহ, ৪. উরফ, ৫. সাদ্দুজ জারাঈ, ৬. সাহাবীগণের ফাতওয়া, ৭. মদীনাবাসীর কর্মকাণ্ড ও ৮. পূর্ববর্তী শরীয়াত।

শরঈ দলীলের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা

শরঈ দলীলের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নীতিমালা রয়েছে, যা অনুসরণ করা জরুরী।

প্রথমত : নস অনুধাবনের ক্ষেত্রে শব্দের দালালাত বা শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেয়া নসে বর্ণিত শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত গবেষক কোনক্রমেই তা থেকে বিধান উদ্ভাবন করতে পারবেন না। এ কারণে ইমাম গাযালী শব্দার্থ তত্ত্বকে উসূলে ফিক্‌হের মূলস্তম্ভ গণ্য করেছেন।[৫৪]

একই কারণে আধুনিক অনেক উসূলবিদ দালালাত তথা শব্দার্থতত্ত্ব অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন "দলীল থেকে বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি বা নীতি"।[৫৫]

দ্বিতীয়ত : নসকে খারাপ উদ্দেশ্যে ও বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার প্রকাশ্য রূপ থেকে বের না করা

বাতিনী সম্প্রদায় যেমনটি করে থাকে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম বলেন, মুফতী মুজতাহিদ বা গবেষক কুরআনের আয়াতের অথবা রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তার উচিৎ নয় যে, নিজের কুপ্রবৃত্তির চাহিদার্থে বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নসকে তার প্রকাশ্য রূপ থেকে বের করে নিয়ে আসবে। যদি কেউ এমন করে তবে তার ফাতওয়া বা ইসলামী বিধানের ভাষ্য দেয়ার অধিকার রহিত হবে এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।[৫৬]

---

৫৩. আল-হাজুরী, মুহাম্মদ ইবনে হাসান, *আল-ফিকরুস সামী ফী তারিখিল ফিক্‌হ আল-ইসলামী*, বৈরূত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ১৪১৬ হি, খ. ৩, পৃ. ৩০

৫৪. আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৫

৫৫. আবু যাহরা, *উসূলুল ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫; আয-যুহায়লী, *উসূলুল ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৭

৫৬. ইবনে কাইয়্যিম, *ইলামুল মুকিঈন* আন-রব্বিল আলামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৯

তৃতীয়ত : বিধানের ফলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া

অর্থাৎ, সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের পরে যাতে এর সাথে শরঈ কোন দলীলের বৈপরিত্য সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া।

চতুর্থত : নস অথবা শব্দতত্ত্বের মধ্যে বৈপরিত্যের ক্ষেত্রে এর মধ্যে সমন্বয়, ধারাবাহিকতার পদ্ধতি অবগত হওয়া

উসূলবিদগণের শর্তানুযায়ী যদি এসবের মধ্যে বৈপরিত্য থাকে তবে সেক্ষেত্রে করণীয়[৫৭]–

১. উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা
২. সমন্বয় সম্ভব না হলে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া
৩. অগ্রাধিকার সম্ভব না হলে ইখতিয়ার প্রদান।

পঞ্চমত : নস বুঝার ক্ষেত্রে আকলে সালীম (সুস্থ বিবেক) কাজে লাগানো

আলিমগণ একমত যে, সুস্থ বিবেক সহীহ্ বর্ণনামূলক দলীলের বিরোধী নয়। তারপরেও যদি সহীহ্ বর্ণনার সাথে আকলের সংঘাত হয় সেক্ষেত্রে বর্ণনাকেই গ্রহণ করতে হবে ও আকল পরিত্যাগ করতে হবে।[৫৮]

২. ফিক্হী কায়িদায় মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

ফিক্হী কায়িদা মুজতাহিদ, গবেষক ফকীহ্, মুফতী, বিচারক ও শাসকের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শরঈ ইলম। ফিক্হী কায়িদার সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহ্গণ দুটি মতামতে বিভক্ত হয়েছেন। প্রথম মত অনুযায়ী এটি এমন এক সামগ্রিক বিষয় যা তার অধীনস্থ সমস্ত শাখার উপর প্রয়োগ করা হয়।[৫৯] দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এটি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধান বা অধিকতর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়, সামগ্রিক নয় যা অধিকাংশ শাখার বিধান নির্ণয়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়।[৬০]

ফিক্হী কায়িদা ও উসূলের কায়িদার মধ্যে পার্থক্য

ফিক্হ ও উসূল মূলত একটি গাছের দুটি শাখা স্বরূপ।একজন ফকীহ্কে যেমন উসূলে পারদর্শী হতে হয়, একইভাবে একজন উসূলবিদকে ফিক্হে পারদর্শী হতে হয়। তবুও উভয়টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে উভয় কায়িদার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

---

৫৭. বারযানজী, আব্দুল লতীফ, *আত্তাআরুদ ওয়াত তারজীহ*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি, খ. ২, পৃ. ১২৮-১৩৪

৫৮. ইব্নে, তাইমিয়া, তকী উদ্দীন, *মাজমু আল-ফাতওয়া*, বিশ্লেষণ: আনওয়ার আল-বায ও আমের আল-জায্যার, আল-কাহেরা: দারুল ওফা, ১৪২৬ হি, খ. ১৬, পৃ. ৪৪৪

৫৯. আল-জুরজানী, আলী ইবনে আহমদ, *আত্-তারিফাত*, বিশ্লেষণ: ইবরাহীম আল-আবয়ারী, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪১৩ হি, পৃ. ২১৯ قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

৬০. কাহ্তানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৭ حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه

ইমাম কারাফী সর্বপ্রথম এ দুই শ্রেণীর কায়িদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর আল-ফুরুক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মুহাম্মদ স.-এর শরীয়ত উসূল ও ফুরু এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ উসূল দুভাগে বিভক্ত–

প্রথমত : উসূলে ফিক্হ, যার মধ্যে বিশেষত আরবী শব্দতত্ত্বের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধানসমূহের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সামগ্রিক ফিক্হী কায়িদা, যার মধ্যে শরীয়াতের বিধান প্রবর্তনের গুঢ়রহস্য বর্ণিত হয়েছে। যার কোন কিছুই উসূলে ফিক্হে বর্ণিত হয়নি।[৬১]

অতএব বলা যায়, ফিক্হী কায়িদা এমন এক বিধান যার অধীনে ফিক্হের অসংখ্য গৌণ বিষয় একত্র হয়। আর উসূলের কায়িদা মূলত এমন নীতিমালাকে বলা হয় যা একজন ফকীহকে শরঈ দলীল থেকে বিধান নির্ণয়ের পন্থা বাতলে দেয়।

ফিক্হী জাবিত (বিধি) ও ফিক্হী কায়িদার (মূলনীতি) মধ্যে পার্থক্য

ফিকহী জাবিত বলা হয় এমন এক সামগ্রিক বিধানকে যা ফিকহের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর প্রয়োগ করা হয়।[৬২] উপরিউক্ত সংগা থেকেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয় যে, কায়িদা বা মূলনীতি এমন এক সামগ্রিক বিষয় যা বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন মাসআলার ওপর প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে জাবিত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উদাহরণ: الأمور بمقاصدها (উদ্দেশের ভিত্তিতে বিধান নির্ধারিত হয়) কায়িদাটি ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায় যেমন- তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাওম, নিকাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা যায়। এমনকি ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটি সত্তরটি অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হয়।[৬৩] কিন্তু জাবিত শুধু একটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন- "মৃতব্যক্তি ব্যতীত যার উপর গোসল ফরয তার ওপর অযুও ফরয" (كل ما أوجب غسلا أوجب وضوئا إلا الموت) এটি শুধু তাহারাতের অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করে।[৬৪]

কায়িদার মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের শর্ত

১. যে কায়িদাটি প্রয়োগ করা হবে সে কায়িদা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শর্ত বাস্তবে থাকা।
   যেমন- المشقة تجلب التيسير
   "কষ্ট সহজিকরণকে টেনে আনে"[৬৫] এ কায়িদাটি বাস্তবায়নের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা হল[৬৬] :

---

৬১. কারাফী, শিহাবুদ্দীন আহমদ, *আল-ফুরুক*, বৈরূতঃ আলিমুল কুতুব, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২

৬২. কাহতানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৬ حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من باب واحد

৬৩. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৬৪. কাহতানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৭

৬৫. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০; ইবনে নুজায়েম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৬৬. আল-কারফী, *আল-ফুরুক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮

ক. কষ্ট বা ক্লেশ বাস্তবেই বর্তমান থাকা।
খ. কষ্ট বা ক্লেশ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া।
গ. উক্ত কষ্ট প্রদান শরীয়াত প্রণেতার উদ্দেশ্য না হওয়া।
ঘ. কায়িদাটি প্রয়োগ করলে যেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু ছুটে না যায়।

২. কায়িদা সংশ্লিষ্ট বিধান তার চেয়ে শক্তিশালী দলীল বা কায়িদা বিরোধী না হওয়া। যেমন–الأصل في الميتات التحريم "ফিকহের মূলনীতি হলো সকল মৃত জীব হারাম"[৬৭]। কিন্তু এটি মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে না। কেননা মৃত মাছ খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে মহানবী স. থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬৮]

৩. যে বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য কায়িদা প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমার কোন নস বর্ণিত না থাকা। অন্যান্য কায়েদার ক্ষেত্রে একই ধরনের সতর্কতা নিতে হবে।

সাম্প্রতিক সমস্যা সমাধানে ফিক্হী কায়িদা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

ক. যে ব্যক্তিকে ICUতে Life Support দিয়ে রাখা হয়েছে তার ব্যাপারে শরঈ বিধান কী হবে? এ সম্পর্কে যে ফিক্হী কায়িদা প্রয়োগ করা যায় তাহল, الحياة المستعارة كالعدم "কৃত্রিম জীবন অস্তিত্বহীনের মত"।[৬৯]

খ. একজন রোযাদার এক দেশ থেকে সাহরী করে বিমান যোগে অন্য দেশে গেলেন যেখানে তার ইফতারের সময়ের ব্যবধান কয়েক ঘণ্টা। তিনি কখন ইফতার করবেন? মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানে تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة "বাহ্যিক অনুধাবনের ভিত্তিতে বিধান নির্ধারিত হয় অজ্ঞাত বাস্তবতা গ্রাহ্য নয়।" এ ফিক্হী কায়িদাটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[৭০]

৩. তাখরীজ ফিক্হীর মাধ্যমে বিধান নির্ণয়

তাখরীজ ফিকহীর সংজ্ঞা

তাখরীজ ফিকহীর সংজ্ঞা বর্ণনায় ইবনে ফারহুন মালিকী বলেন, "নসভিত্তিক কোন মাসআলার বিধান থেকে (সাদৃশ্যপূর্ণ) মাসআলার বিধান নির্গমণ।"[৭১]

---

৬৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪
৬৮. বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায় : আত-তাহারাত, অনুচ্ছেদ : হুত ইয়ামুতু ফীল মায়ি ওয়াল জারাদাহ, খ. ১, পৃ. ২৫৪, أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد والحيتان والكبد والطحال.
৬৯. আল-মুকরী, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, *আল-কাওয়ায়েদ*, বিশ্লেষণ: ড. আহমদ ইবনে হুমাইদ, মক্কা: উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৪৮২
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১
৭১. আল-মালিকী, ইবনে ফারহুন, *কাশফুন নিকাব আল-হাজিব ফী মুসতালিহ ইবনুল হাজিব*, বিশ্লেষণ: হামযাহ আবু ফারিস ও আব্দুস সালাম শরীফ, বৈরূত: দারুল গারব আল-ইসলামী, ১৯৯০, পৃ. ১০৪ استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة

শায়খ আলভী আস্‌সাক্কাফ বলেন, মাযহাবের ফকীহ্গণ কর্তৃক কোন বিষয়ে তাদের ইমামের বর্ণিত বিধানের অনুরূপ বিধান অন্য বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করাকে তাখরীজ ফিকহী বলা হয়।[৭২]

আহমদ ইবনে তাইমিয়া বলেন, "কোন মাসআলার বিধানকে তার অনুরূপ মাসআলার জন্য বহন করা এবং এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা।"[৭৩]

এককথায়, মাযহাবের ইমামগণের মতামত ও নীতিমালার আলোকে শরঈ প্রায়োগিক বিধান বা বিধানের নীতিমালা নির্ণয় করাকে ফিক্হী তাখরীজ বলে।

ফিক্হী তাখরীজের মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা

১. কুরআন সুন্নাহ'র নস বর্তমান থাকা অবস্থায় ইমামগণের মতামতের আলোকে বিধান নির্ণয় না করা।

২. বিধান নির্ণয়কারীকে মাযহাবের নীতিমালা ও তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা থাকতে হবে।

৩. বিধান নির্ণয়কারীকে ব্যাপকার্থে উসূলে ফিক্হ ও বিশেষভাবে কিয়াস বিষয়ে জ্ঞানবান হতে হবে।

৪. বিধান নির্ণয়কারীকে মাযহাবী উসূলের সাথে ফুরুয়ের সংযোগ স্থাপন ও উৎস অবগত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে, যাকে উসূলবিদগণ فقه النفس স্বভাবজাত ফকীহ্ নামে অভিহিত করেছেন।

৫. উদ্ভূত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও ফিক্হী শাখা-প্রশাখার পার্থক্য সম্পর্কে দক্ষ হতে হবে।

৬. ইমামগণের মতামত যা আলিমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য উৎসে বর্ণিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়।[৭৪]

তাখরীজের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের উদাহরণ

ক. বাণিজ্যিক বীমা: ফকীহ্গণ তাদের তাখরীজের ভিত্তিতে এর বিধান নির্ণয়ের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। একদল গবেষক জুয়ার সাথে তুলনা করে ও গারারের সাদৃশ্যতার কারণে একে হারাম বলেছেন। অন্যদিকে একদল একে তাবাররুর সাথে তুলনা করে বা আকীলা চুক্তির ভিত্তিতে বৈধ বলেছেন।[৭৫]

খ. গ্রন্থস্বত্ব: এ আধুনিক বিষয়টির বিধান বর্ণনা করতে যেয়ে বর্তমান যুগের আলিমগণ তাদের তাখরীজের ভিন্নতার কারণে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ

---

৭২. আস্‌সাক্কাফ, আলুভী, *আল-ফাওয়ায়িদ আল-মাক্কীয়াহ*, বৈরূত: মাকতাবাহ্ আল-বাবী আল-হালবী, তা. বি. পৃ. ৪২ أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة

৭৩. ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ ইব্‌নে আব্দুল হালীম, *আল-মুসাওয়াদাহ্*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ, বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি, পৃ. ৫৩৩। نقل مسألة إلى ما يشبهها و التسوية بينهما

৭৪. কাহ্তানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৩-৫৫৩

৭৫. যারকা, ড. আনাস, *আত্ তামীন ওয়া মাওকাফুশ শরীআহ আল-ইসলামীয়াহ মিনহু*, বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪১৫ হি, পৃ. ৩০-৩২

গ্রন্থকে উৎপন্নদ্রব্য (Product) বিবেচনা করে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত রাখা বৈধ বলেছেন। আবার কেউ কেউ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে যায় বিধায় গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ বৈধ নয় বলেছেন।[৭৬]

৪. মাকাসিদে শরীআহর শরীয়'ত প্রণেতার উদ্দেশ্য-এর ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ন

মাকাসিদে শরীআহ প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের আলিমগণের নিকট অতি পরিচিত একটি পরিভাষা। কিন্তু পূর্ববর্তী আলিমগণ এর কোন সংগা প্রদান করেননি। এমনকি ইমাম শাতেবীও না, যিনি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন।

এক কথায় বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বাস্তবায়নের জন্য শরীয়াত প্রণেতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশেষ যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন তাকে বলা হয় মাকাসিদে শরীআহ।[৭৭] এ পরিভাষাটি বুঝানোর জন্য অন্যান্য কিছু শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন– মাসলাহা, হিকমাহ, ইল্লাত ইত্যাদি।

মাকাসিদের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাকাসিদে শরীআহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত[৭৮]–

১. যেসব কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে সে দৃষ্টিতে মাকাসিদ তিন প্রকার :
   ক. অত্যাবশ্যকীয়, খ. প্রয়োজনীয় (পরিপূরক), গ. উন্নতিবাচক
২. মর্যাদাগত দিক থেকে দুই প্রকার : ক. মৌলিক খ. সম্পূরক
৩. ইসলামী বিধান অন্তর্ভুক্তির দিক থেকে তিন প্রকার :
   ক. সাধারণ উদ্দেশ্য (সামগ্রিক) খ. বিশেষ উদ্দেশ্য (অধ্যায় ভিত্তিক)
   গ. গৌণ উদ্দেশ্য (নির্দিষ্ট বিষয়)

মাকাসিদে শরীআহ'র ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে করণীয়

প্রথমত : মাকাসিদে শরীআহ'র পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন

ইমাম শাতিবী শরঈ বিধান উদ্ভাবক বা মুজতাহিদের জন্য দুটি শর্ত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন তিনি ইজতিহাদের যোগ্য হবেন। একটি হল, পূর্ণভাবে মাকাসিদে শরীআহ অনুধাবন এবং অন্যটি হল, উক্ত অনুধাবনের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন।[৭৯]

---

৭৬. উসমানী, মুহাম্মদ তাকী, *বুহূস ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ*, কুয়েতঃ দারুল কলম, ১৪১৯ হি, পৃ. ১১৯

৭৭. রায়সূনী, ড. আহমদ, *নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশ্‌শাতিবী*, ওয়াশিংটনঃ আইআইআইটি, ১৪১২ হি, পৃ. ৭ الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

৭৮. প্রকারভেদগুলোর বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ কাহতানী, ড. মুফসির, *মানহাজু ইসতিম্বরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯১-৬০৮

৭৯. আশ্‌শাতিবী, ইবরাহীম ইবনে মূসা, *আল-মুআফাকাত*, বিশ্লেষণঃ আবু উবায়দা ইবনে হাসান, রিয়াদঃ দারু আফফান, ১৪১৭ হি, খ. ৫, পৃ. ৪১

দ্বিতীয়ত : মাকাসিদে শরীআহ অবগত হওয়ার পদ্ধতি

ক. ইস্তিকরা অর্থাৎ শরীয়াতের নস, বিধিবিধান, কারণ (ইল্লাত) ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান।

খ. আদেশ-নিষেধের কারণ।

গ. কল্যাণ-অকল্যাণের বিশ্লেষণ।[৮০]

তৃতীয়ত : মাকাসিদে শরীআহ'র চারটি শর্ত

ক. কল্যাণের বিষয়টি অকাট্য হবে। এ কারণে পালকপুত্র প্রথা ইসলাম রহিত করেছে।

খ. প্রকাশ্যমান হবে। যেমন– বিবাহের উদ্দেশ্য বংশ রক্ষা করা।

গ. দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করা হলেও উদ্দেশ্য একটি হতে হবে। যেমন– মদ হারাম হওয়া ও এর সাথে সাথে শাস্তি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য একটিই তা হল, বুদ্ধির সংরক্ষণ।

ঘ. ব্যাপক, সামগ্রিক ও শাশ্বত হওয়া।[৮১]

চতুর্থত : কল্যাণ নির্ণয় পদ্ধতি

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার কল্যাণেই শরীয়াত প্রবর্তন করেছেন। এই কল্যাণের কাজই হল শরীয়াতের উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা।

ইমাম রাযী বলেন, কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনায় মানুষের কর্মকাণ্ড ছয় ধরনের হয়ে থাকে–

১. যাতে শুধু কল্যাণ রয়েছে। অকল্যাণ বলতে কিছু নেই। এ কাজটি শরীয়াত সম্মত হওয়া নিশ্চিত।

২. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই রয়েছে। তবে কল্যাণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এটিও শরীয়াত সম্মত হওয়া উচিৎ। কেননা সামান্য অকল্যাণের জন্য অনেক কল্যাণ পরিত্যাগ করা দূষণীয়।

৩. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ সমান। এটি একটি নিরর্থক কাজ। যা শরীয়াত সম্মত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৪. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ কোনটিই নেই। এটিও একটি নিরর্থক কাজ। অতএব তাও শরীয়াত সম্মত হতে পারে না।

৫. এককভাবে অকল্যাণ নিহিত। নিশ্চিতভাবে এটি শরীয়াত সম্মত হবে না।

৬. যাতে কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই রয়েছে তবে অকল্যাণই অগ্রগণ্য। এটিও শরীয়ত সম্মত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অকল্যাণ দূরীভূত করা আবশ্যক।[৮২]

---

৮০. রায়সূনী, ড. আহমদ, *নাজরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাল ইমাম আশশাতিবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৮১. আয-যুহায়লী, ড. ওহাবাহ, *উসূলুল ফিক্‌হ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০১৭

৮২. আল-রাযী, ফখরুদ্দীন ইবনে উমর, *আল-মাহসূল*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি, খ. ২, পৃ. ৫৮০

ইমাম গাযালী মাকাসিদে শরীআহ, ভিত্তিতে বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন[৮৩]–

১ম, কল্যাণ অত্যাবশ্যক হওয়া।

২য়, কল্যাণ সামগ্রিক হওয়া, গৌণ না হওয়া।

৩য়, কল্যাণ অকাট্য হওয়া, ধারণাপ্রসূত না হওয়া।

ইমাম শাতেবী মাসালিহে মুরাসালাহর ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত প্রদান করেছেন–

১. কল্যাণ চিন্তা ও শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। শরীয়াতের কোন মূলনীতি বা কোন দলীলের সাথে এটা সাংঘর্ষিক হবে না।

২. সত্তাগতভাবে বিষয়টি জ্ঞান-বিবেকসম্মত হওয়া। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে যখন সেটা উপস্থাপিত হবে তখন সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি যেন তাকে সমর্থন করে।

৩. তা গ্রহণের ক্ষেত্রে শর্ত হল, এর দ্বারা যেন নিশ্চিত কোন সংকটের অবসান হয় এবং যদি এটা গ্রহণ করা না হয় তবে মানুষের চরম সংকটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৮৪]

পঞ্চমত : মাকাসিদ সংক্রান্ত কায়িদার মূলনীতি ও প্রয়োগ

আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ও অন্যান্য উসূলে ফিক্‌হরে গ্রন্থসমূহে মাকাসিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফিকহী কায়িদা উল্লেখ করা হয়েছে। মাকাসিদের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে আগ্রহী গবেষককে যার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্তব্য।

উপসংহার : ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামী বিধান নির্ণয়ের পদ্ধতি তাই এ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। মহানবী স.-এর সময়ে মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিধান জানিয়ে দিতেন অথবা রসূলুল্লাহ স. নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বর্তমান সময়ে রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর অবর্তমানে কীভাবে সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয় করা যায়।

উপরিউক্ত তথ্য-উপাত্তের মূল্যায়ন করে আমরা নিম্নোক্ত ফলাফল অর্জন করতে পারি–

১. যুগ পরিক্রমায় মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ইসলামের গতিশীলতা স্থবির হয় না।

২. যেসব নতুন নতুন আবিষ্কার বা সমস্যার কোন ইসলামী সমাধান নেই তাকে আমরা সাম্প্রতিক বিষয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।

---

৮৩. আল-গাযালী, *আল-মুস্তাসফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৬

৮৪. আশ-শাতেবী, ইমাম ইবরাহীম ইবনে মূসা, *আল-ইতিসাম*, বৈরূত, দারুল মাআরিফা, ১৪০২ হি., খ. ২, পৃ. ১২৯

৩. ইসলামের গতিশীলতা প্রমাণ, মুসলমানদের সমস্যা দূরীকরণ, ইজতিহাদের ধারা চলমান রাখাসহ বিভিন্ন কারণে সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের গবেষণা করা প্রয়োজন।

৪. সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন গবেষককে গবেষণার পূর্বে বিষয়টি অনুধাবন ও এ সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয় এবং জীবনের সাথে এর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে হবে।

৫. এ বিষয়ে গবেষণার সময়ে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৬. শরীআহ অভিযোজন মানুষের নিত্যনতুন সমস্যার সমাধানে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের জন্য অকল্যাণকর নয় এমন বিষয়কে বৈধতা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়।

৭. আধুনিক সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি শরঈ দলীল। এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দেয়া হলে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না।

৮. শরঈ দলীলের ভিত্তিতে আধুনিক বিষয়ের সমাধান না হলে দ্বিতীয়ত আমাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে ফিকহী কায়িদার উপর। ফিক্হী কায়িদা মূলত শরঈ দলীল থেকে ফিক্হবিদগণের গবেষণালব্ধ নীতিমালা, যা প্রত্যেক যুগের আলিমগণ প্রয়োগ করেছেন।

৯. শরঈ দলীল ও ফিক্হী কায়িদার অবর্তমানে আধুনিক বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে মাযহাবের নীতিমালার আশ্রয় নিতে হবে। মাযহাবের ইমামগণের গবেষণালব্ধ বিধানের সাদৃশ্য বিধান সমজাতীয় বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১০. সর্বশেষ আমরা মাকাসিদ শরীআহ'র মাধ্যমে বিধান নির্ণয়ের পন্থা অবলম্বন করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মাকাসিদ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে গবেষকের পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

ইসলামী আইনে সন্তানের ভরণ-পোষণ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : *ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। আদম আ. ও তাঁর পত্নী হাওয়া আ. মানবকুলের মূল উৎস। তাঁদের উভয়ের মাধ্যমেই আজকের পৃথিবীতে মানুষের বসবাস। সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি অনন্য উপহার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আশার আলো। সন্তান হলো দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলুষ পুষ্প বিশেষ। মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই কিছু মৌলিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। ইসলাম মানব সন্তানের সেসব অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান। শিশু বা সন্তানের অধিকার ও সার্বিক বিকাশের বিষয়টি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কে কাকে এবং কী কী পরিস্থিতিতে ভরণ-পোষণ দিবে তা পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ভরণ-পোষণ দাবি করতে পারে। বিবাহ বা রক্ত সম্পর্কীয় অধিকারের কারণে একজন আরেকজনকে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য। আলোচ্য নিবন্ধে প্রাসঙ্গিকতার নিরীখে ধারাবাহিকভাবে ভরণ-পোষণের সংজ্ঞা, ইসলামে ভরণ-পোষণের গুরুত্ব, ভরণ-পোষণ না দেয়ার পরিণতি, সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, কতদিন পর্যন্ত এ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।*]

ভরণ-পোষণের সংজ্ঞা

আরবী শব্দ 'নাফাকা' نفقة এর অর্থ– পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়।[১] পরিভাষায়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করাকে নাফাকা (ভরণ-পোষণ) বলে।[২]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলিমুজ্জামান বলেন : ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র ও বসবাসের সংস্থানকে বুঝায়।[৩] তবে এ সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ, শিক্ষার খরচ এবং শরীর ও মানসিক পুষ্টির জন্য অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ও এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা

১. ইব্নে আবিদীন, মুহাম্মদ আমীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি., খ. ১, পৃ. ৬২৮

২. আবু জাবির, সাইয়্যিদ, *আল-কামুছ আল-ফিকহি* , করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৩৫৯

৩. চৌধুরী, আলিমুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫, পৃ. ৩৯৪

মোটকথা ভরণ-পোষণ হলো, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করা তথা মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

ভরণ-পোষণের গুরুত্ব

ইসলাম পরিবার-পরিজন ও সন্তানের ভরণ-পোষণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. বলেন; রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।[৪]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আনাস ইব্‌নে মালিক রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করাবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসাথে থাকবো।"[৫] বস্তুত কিয়ামতের দিন নবী স.-এর সঙ্গী হতে পারা অপেক্ষা বড় আনন্দের ও মর্যাদার ব্যাপার মুমিন ব্যক্তির জন্য আর কিছু হতে পারে না।

অপর এক হাদীসে এসেছে, আদী ইবনে সাবিত বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযিদ আল-আনসারীকে বলতে শুনেছি। তিনি আবু মাসউদ আল-আনসারী রা. সূত্রে বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যখন কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু খরচ করে এবং তাতে সওয়াবের আশা রাখে এই খরচ তার জন্য সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়।"[৬]

---

৪. আবূ দাউদ, ইমাম, সুলায়মান ইবনে আল-আশআস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতামা, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৫৯৯

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة

৫. মুসলিম, ইমাম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিবরু ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল ইহসানি ইলাল বানাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১৩৬

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه

৬. বুখারী, ইমাম, আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল আহল, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৪৬২

عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে এসেছে– "সা'দ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ স. আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। আমি বললাম : আমার অর্থ-সম্পদ আছে, আমি কি সবকিছুর জন্য অছিয়ত করতে পারি? তিনি বললেন–

সন্তানের ভরণ-পোষণ হচ্ছে তার খানাপিনা, থাকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যতদিন সে নিজস্বভাবে উপার্জন করতে অক্ষম থাকবে। আর যদি কেউ তা না করে তাহলে তার প্রতি রসূলুল্লাহ স. হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন– "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে সে গোনাহগার হবে।"[৭]
এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, "যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুনাহ্ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৮]

পরিবারের জন্য ব্যয় এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা উত্তম সাদাকাহ তুল্য। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, সাওবান রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, একজন ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে সেটি, যা সে তার পরিবারবর্গের জন্য খরচ করে। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্য। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের সঙ্গী-সাথীদের জন্য।"[৯]

এ হাদীসে প্রথমেই পরিবারবর্গ তথা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকেই সর্বোত্তম ব্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে,

---

না। আমি বললাম– তবে অর্ধেক মালের জন্য? তিনি বললেন– না। আমি পুনরায় বললাম– এক-তৃতীয়াংশের জন্য? তিনি বললেন : তুমি এক-তৃতীয়াংশের উপর অছিয়ত করতে পার। তবে ইহাও বেশী। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের নিকট হাত পাততে বাধ্য হবে। এই রূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার বদলে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক ভাল। তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সাদকাহ হিসেবে গন্য হয়। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাদ্যের যে লোকমাটি তুলে দাও তাও সাদকাহ্। আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।

عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك ولعل الله يرفعك

প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি আলাল আহলি, প্রাগুক্ত

৭. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফী সিলাতির রিহমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৯

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

৮. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি 'আলাল 'ইয়াল আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৮৩৫

৯. মুসলিম, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলুন নাফাকাতি 'আলাল 'ইয়াল, প্রাগুক্ত।

ছাওবান রা. হতে বর্ণিত– عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله.

পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করানো শুধু একটি উত্তম কাজই নয় বরং একটি উত্তম ইবাদতও বটে।

ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা

ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে কখনও পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "যা কোন কন্যা সন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[১০]

নু'মান ইবনে বশীর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি : "তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝেই ইনসাফ কায়েম কর।"[১১]

এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, নু'মান ইব্‌নে বশীর রা. বলেন– একবার আমার পিতা আমাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– তুমি কি তোমার সব ক'টি সন্তানকে এভাবে একটি করে ক্রীতদাস দান করেছ? উত্তরে তিনি বললেন– না। তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– তুমি এ দান ফিরিয়ে নাও।"[১২]

এ সব হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য। কেননা যদি বিশেষ কোন কারণ না থাকে, তাহলে রসূলুল্লাহ্ স.-এর এ হুকুমকে কিছুতেই অমান্য করা উচিত হবে না। আর যদি কোন

---

১০. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাদলি মান 'আলা ইয়াতীমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯৯

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة

১১. عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم.

আবূ দাউদ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : ফীর রজুলি ইউফাদ্দিলু বা'দা ওয়ালাদিহি ফীন নাহলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৬

১২. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় আল-হিবা, অনুচ্ছেদ : হিবা লিল ওয়ালাদি. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه.

সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কোন কিছু অতিরিক্ত দান করা হয় তবে তা হবে বড় অন্যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী র. বলেছেন– "প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা হচ্ছে এই, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা কর্তব্য, আর কম-বেশী করা হারাম।"[১৩]

ভরণ-পোষণের দায়িত্ব

সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব হলো একমাত্র পিতার। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিভিন্ন দেশের সংবিধান সন্তানের ভরণ-পোষণে যাতে কোন প্রকার সমস্যা না হয় এবং সন্তান যেন সঠিকভাবে বেড়ে ওঠতে পারে সে জন্য পিতার অবর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব বন্টনের ব্যবস্থা করেছে। যেমন– পিতার অক্ষমতা ও অবর্তমানে মাতা, তারপর তার নিকটাত্মীয়, এর পরও যদি কোন ব্যক্তি সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে না চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে সেদেশের সরকারকেই সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার নিতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো–

সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্ব

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময়ও পিতার ভরণ-পোষণ বহন করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাআলা আল-কুরআনে বলেছেন : "আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কারো ওপর বোঝা চাপানো হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য।"[১৪]

এমনকি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান থাকাকালেও গর্ভে সন্তান ধারণ করার জন্য গর্ভবতী মায়ের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং সকল প্রকার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার উপর ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "তোমাদের সামর্থ্য

---

১৩. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে 'আলী, *নাইলুল আওতার*, আল-কাহেরা : মুসতাফা আলবাবী আল-হালাভী, তা.বি., খ. ৯, পৃ. ২২১
আল্লামা-শাওকানী বলেন–

أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده ، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم ، ذكره ابن عبد البر قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه ؛ لأنه قياس مع وجود النص ا هـ . فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم.

১৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর; আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করালে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধপান করাবে।"[১৫]

পিতা যে কোন পরিস্থিতিতে তার নাবালক সন্তান-সন্ততিকে ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য।[১৬] উল্লেখ্য যে, কেউ সন্তান-সন্ততিসহ কোন বিধবাকে বিবাহ করলে এই ব্যক্তিকে বিধবার নাবালক সন্তান-সন্ততিকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে।[১৭]

ভরণ-পোষণ আইন মোতাবেক সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, পিতা-মাতামহ, নাতি-নাতনী ও ভাইবোনদের ওপর পর্যায়ক্রমে ভরণ-পোষণ ভার অর্পিত হয়। শিয়া মতে নিকটতর সন্তান সন্ততি এবং পূর্ব বংশীয়দের ভরণ-পোষণ ভার যৌথভাবে বহন করতে হয়। শিআ মতে নিম্নোক্ত মতে ক্রমানুসারে ভরণ-পোষণের ভার অর্পিত হয়-

১. পিতা ২. নিকটতর পিতামহ (যত উর্ধ্বে হোক না কেন) ৩. মাতা ৪. নিকটতর মাতামহ (যত উর্ধ্বে হোক না কেন।)[১৮]

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতের সময়কাল পর্যন্ত খোরপোষ পাবে।[১৯] অর্থাৎ তিনমাস পর্যন্ত।[২০] তবে স্বামীর অবাধ্য হলে পাবে না।[২১] স্বামী তখন স্ত্রীকে তা দিতে বাধ্য হবে না।[২২] আদালত পূর্বেই স্থির না করে থাকলে, সন্তানগণ দরখাস্ত পূর্বের ভরণ-পোষণ পাবে

---

১৫. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩,
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.

১৬. আল-মাওসূলী, ইবনে মাওদূদ, *আল-ইখতিয়ারা লি তা'লীলিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩৯

১৭. ড. সরুউত আনিছ আল-উসইউতী, *ফালসাফাতুত তারীখুল 'ঈকাবী*, আল-কাহেরা : সমসাময়িক মিশরীয় জার্নাল, ১৯৬৯ সংখ্যা-২৫৫, পৃ. ২৫১-২৫৩; ইবনে ফারহুন মালেকী, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, আল-কাহেরা : আল-মুতাকাদ্দিমুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২০৬; হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমাম আবূ হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩২৯

১৮. ওহমান, এম. হাবিবুর, *মুসলিম আইন*, ঢাকা : আলীগড় লাইব্রেরী, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১৮১-১৪৩।

১৯. Shah Azmallah v. Imtiaz Begum, 11 DLRW. P. 74.

২০. আল-মাওসূলী, *আল-ইখতিয়ারা লি তা'লীলিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯

২১. Mitha Khan v. Hemayat Bibi, 11 DLRW.P. 17; 14 DLR, P. 465; 19 DLRW. P. 50.

২২. Ibid, P. 582.

না।[২৩] যে সন্তান নিজস্ব জমি বা সম্পত্তির আয় হতে নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে সামর্থ্য রাখে তার ভরণ-পোষণ দিতে পিতা বাধ্য নয়।[২৪]

যে ক্ষেত্রে পিতা তার কন্যাকে হিফাজতের অধিকারী এবং স্বীয় গৃহে রেখে কন্যাকে ভরণ-পোষণ দিতেও প্রস্তুত, সেখানে পিতৃগৃহ হতে দূরে থাকার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি না থাকলে, কন্যা পিতার নিকট হতে পৃথক ভরণ-পোষণ দাবি করতে পারে না।[২৫]

যে ক্ষেত্রে পিতা শিশুর মাকে তালাক দিয়ে উক্ত শিশুর অভিভাবকত্ব পাবার জন্য ডিক্রি পেয়েছেন (কন্যার বয়স নয় বছর), অথচ ডিক্রিটি জারী করেনি, যেন কন্যা তার মায়ের সাথে থাকতে পারে, সেখানে আদালতের রায়ে ঘোষণা করা হয় যে, শিশুটি ভরণ-পোষণের অধিকারী।[২৬]

অপর একটি মামলায় যেখানে পিতা পুনরায় বিবাহ করেন কিন্তু প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেননি এবং প্রথম গর্ভজাত সাত বছর পূর্ণ হয়েছে এমন দুই সন্তানকে ভরণ-পোষণ দানে ইচ্ছা করেছেন, যেখানে স্থির হয় যে, সন্তান দু'টিকে মা তাদের পিতার নিকট পাঠিয়ে না দিলে, পিতা তাদের ভরণ-পোষণ ভাতা প্রদান করতে বাধ্য নয়।[২৭]

আর্থিকভাবে সচ্ছল কোন ব্যক্তি যদি তার বিত্তহীন স্ত্রী বা সন্তানের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে তার স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অর্থ দেয়ার আদেশ দিতে পারেন। যে তারিখে এ ধরনের মামলা করা হয় সেই তারিখ হতে এই অর্থ দেয়ার আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারেন। আদেশ পাওয়ার পর সঙ্গত কারণ ব্যতীত আদিষ্ট ব্যক্তি যদি আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট এই অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করতে এবং অনাদায়ে প্রত্যেক মাসের অর্থের জন্য তাকে এক মাসের জেল দিতে পারেন। পুরুষ যেখানে স্ত্রী ও সন্তানের সাথে বসবাস করে, সেই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্ত্রী বা সন্তান মামলা করতে পারেন। মামলা করার পর ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তির উপর নোটিশ জারির নির্দেশ দিবেন। ম্যাজিস্ট্রেট যদি বুঝতে পারেন, ঐ ব্যক্তি নোটিশ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট একতরফাভাবে শুনানি করে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। তবে তিন ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট তার আদেশ পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন–

১. যদি স্বামী গরীব হয়ে যায় বা স্ত্রী বিত্তবান হয়
২. যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয় বা
৩. দেওয়ানী আদালতের আদেশ।[২৮]

---

২৩. Emperor v. Ayshabai, (1094), P. 6; Bom L.R. P. 538.
২৪. চৌধুরী, আলিমুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪
২৫. Baybai v. Esmail Ahmed, (1941), Bom. P. 643.
২৬. Mohammad Shamsuddin v. Noor Jahan Bagum, 1955, Hyd p. 418.
২৭. দি সাব কাশিম বনাম মোহাম্মদ হোসেন ('৪৫) বোম. এল.আর ৩৪৫
২৮. মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, *ক্রিমিনাল ড্রাফটিং এণ্ড প্রাকটিস*, ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৭, পৃ. ৩০৮-৩০৯

সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব

স্বামী যদি সংসারের স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয় তাহলে স্ত্রীও সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারে। অথবা স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীকে সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "সাধ্যের অতিরিক্ত কারো ওপর বোঝা চাপানো হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য।"[২৯]

স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ করা স্বামী বা পিতার ওপর অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে : একবার মুআবিয়া রা.-এর মাতা হিন্দা রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে ফরিয়াদ করেন, তার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। গোপনে তার সম্পদ থেকে কিছু নেয়া কি ঠিক হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন : যতটুকু প্রয়োজন ন্যায়ের সাথে তা নিতে পারো।"[৩০]

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ্ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "আমার পিতা সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। তারপর আমি এক প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করি। রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম– হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী না প্রাপ্ত বয়স্কা? আমি বললাম– প্রাপ্ত বয়স্কা। তিনি পুনরায় বললেন– তুমি কেন কুমারী বিবাহ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতে পারতো? জাবির রা. বলেন– আমি রসূলুল্লাহ স.-কে জানালাম 'আব্দুল্লাহ্ কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে ইন্তিকাল করেছেন, আমি তাদের মতই কুমারী বিবাহ করা পছন্দ করিনি। তাই আমি বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি যাতে সে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন।"[৩১]

---

২৯. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

৩০. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মান আজরা আমরাল আমসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.

৩১. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, অনুচ্ছেদ : 'আওনুল মার'আতি জাওযিহা ফী ওয়ালাদিহি, প্রাগুক্ত

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك.

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, উম্মে সালমা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। "আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামা-এর সন্তানদের ভরণ-পোষণ করালে কি আমার সাওয়াব হবে? এরা তো আমারও সন্তান। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন : তুমি তাদের জন্য খরচ করো, তুমি যা খরচ করবে তার সাওয়াব পাবে।"[৩২]

পিতা গরীব হলে এবং নিজস্ব পরিশ্রমের বলে উপার্জনে অক্ষম হলে, মায়ের অবস্থা সচ্ছল হলে, পিতার ন্যায় মা তাঁর ছেলে মেয়েদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য।[৩৩]

সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ওয়ারিশ তথা নিকটাত্মীয়দের দায়িত্ব

যদি কোন সন্তানের পিতামাতা না থাকে অথবা পিতামাতা তাদের সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার বহন করতে অক্ষম হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের ওয়ারিস তথা নিকটাত্মীয়দেরকেই এ সন্তানের দায়িত্বভার নিতে হবে।[৩৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "আর ওয়ারিসের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানকে অন্য কোন মহিলার থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখতে পান।"[৩৫]

কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ ভরণ-পোষণ বহন করতে বাধ্য থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ কেউ কেউ পেতেও পারে। ভরণ-পোষণকারী এবং ভরণ-পোষণ দাবীদারদের সাথে সম্পর্কের উপর তা নির্ভর করে। বিবাহ নিষিদ্ধ গরীব আত্মীয়-স্বজন স্বচ্ছ আত্মীয়স্বজনের কাছ হতে ভরণ-পোষণ পেতে পারে।[৩৬]

---

৩২. মুসলিম, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : বাবু ফাদলুন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন, প্রাগুক্ত,
عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.

৩৩. চৌধুরী, আলিমুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৪

৩৪. আল-মাওসূলী, *আল-ইখতিয়ারা লি তা'লীলিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০

৩৫. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

পিতা গরীব ও দৈহিকভাবে অসমর্থ হলে এবং মাও গরীব হলে, দাদার অবস্থা সচ্ছল হলে ঐ সকল ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দাদার উপরই ন্যস্ত হবে।[৩৭] এমনিভাবে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে একজন ধনী ব্যক্তির জন্য তার গরীব পিতা-মাতা, ছোট ও বড় সন্তান (তথা অন্ধ, খোড়া ও পাগল) তারা যদি গরীব ও দরিদ্র হয় তাহলে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৩৮]

সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব

সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয় ভার বহন করা পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। তাদের অবর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিবেন। যেমন হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। "রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধ করার মত, সম্পদ রেখে গিয়েছে কি-না। যদি বলা হতো, সে তার ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে রসূলুল্লাহ্ স. তার জানাযার নামায আদায় করতেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদেরকে বলতেন– তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ স.-কে অসংখ্য বিজয় দান করলে, তিনি বললেন– আমি মুমিনদের জন্য তার নিজ সত্তার তুলনায় অধিক কল্যাণকামী। কাজেই কোন মুমিন ঋণ রেখে মারা গেলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার উত্তরাধিকারীদের।"[৩৯]
আলোচ্য হাদীসের বর্ণনায় বুঝা যায়, যদি সন্তানের পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয় কেউ সন্তানের ভরণ-পোষণ না চালাতে পারে অথবা তারা যদি বর্তমান না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানই সন্তানদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে দরিদ্র, অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন-পাঁলনের খরচাদি রাষ্ট্রপ্রধান বায়তুলমাল থেকে সরবরাহ করবেন।[৪০] উমর রা. তার খিলাফতকালে প্রত্যেক

---

৩৭. আস্-সামারকান্দী, 'আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ, *তুহফাতুল ফুকাহা*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ২, পৃ. ১৬৫; আল-মাওসূলী, ইবনে মাওদূদ, *আল-ইখতিয়ারা লি তা'লীলিল মুখতার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩৯; এম. হাবিবুর রহমান, *মুসলিম আইন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮১-১৪৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪ ।

৩৯. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আল-কাফালা, অনুচ্ছেদ : 'আদ-দাইন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৯
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته

৪০. ইবনে আবিদ দুনিয়া, *আননাফাকাতি 'আলাল 'ইয়াল*, বৈরূত : আল-মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি., পৃ. ২৫৮

দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য 'দশ দিরহাম' ভাতা প্রদান করতেন এবং একটু বড় হলে দুই শত দিরহাম ভাতা প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "রসূলুল্লাহ স. বলতেন– "যদি কেউ সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীগণের। কিন্তু যদি কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় অথবা অসহায় শিশু রেখে মারা যায় তবে সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার।"[৪১]

এ হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয়, শিশু, বিধবা, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণসহ সার্বিক দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের এবং শাসক এর যিম্মাদার হবে। এ জন্য উমর রা. বলেছেন– "জেনে রেখ, আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তা হলে ইরাকের বিধবাদের এমন অবস্থায় রেখে যাবো যেন আমার পরে তাদের কোন আমীরের মুখাপেক্ষী না হতে হয়।"[৪২]

অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণ

জন্মের জন্য শিশু নিজে দায়ী নয়। জন্মকে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুর জন্মস্থান বা কোন পরিবারে জন্মাবে, এ ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রকাশ বা কার্যকর করতে পারে না। সুতরাং কোন সন্তান তার পিতা-মাতার বিবাহ বন্ধনের বাইরেও যদি জন্ম নেয় সে জন্য তার কোন অপরাধ নেই। অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান জন্মদানের জন্য তার পিতা-মাতা অপরাধী হবে, পিতা-মাতা শাস্তি ভোগ করবে, শিশু নয়। শিশু সমাজের কাছে সকল প্রকার নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণের অধিকার রাখে। সমাজের কাছে শিশুর অধিকার অনেক। শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভ, খাবার, পরিচর্যা, আবাস, কাপড়-চোপড়, চিকিৎসা এবং শিক্ষা এসব ক্ষেত্রে পিতামাতার বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে যে শিশুটি জন্মেছে তার অধিকার যেমন, সেই শিশুরটিরও ঠিক তেমন অধিকার যে তার পিতা-মাতার বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্মেছে। শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারে কোন হেরফের করা যাবে না, করলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল হবে।

যত্ন এবং সহায়তার অধিকার সকল সন্তানের একরকম, তা সে বিবাহজাত হোক বা বিবাহ বহির্ভূত হোক। মুসলিম আইনে সন্তানের জন্মের বৈধতা ও পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড হচ্ছে বিবাহ। সন্তানের পিতৃত্ব তার পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হলে মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট পিতার ঐ সন্তানকে বৈধ

---

৪১. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : ইজতিনাবিল বিদা'ঈ ওয়াল জাদালি, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৭৯

عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ...

وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي.

৪২. আল-কুরাইশী, ইয়াহইয়া ইবনে আদাম ইবনে সুলায়মান, *আল-খারাজ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২০৮. উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন– قال عمر : أما والله لئن بقيت

لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا يفتقرون إلى أمي بعدي

সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দান করা যাবে না। তাই সন্তানের বৈধতার স্বীকৃতির জন্য পিতা-মাতার বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এর ফলে সন্তান পিতার উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব এবং ভরণ-পোষণের মত কতগুলো সুনিশ্চিত অধিকার লাভ করে। মুসলিম আইন অনুসারে পিতার সঙ্গে পুত্রের যে বৈধ সম্পর্ক রয়েছে তাকে পিতৃত্ব বলে। ডি.এফ.মুল্লা বলেন, Paternity is the relation between the father and the child.[৪৩]

বস্তুত সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয় বা ইসলামী বিধানে 'নসব' বলা হয়। এর ভিত্তি হল একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক। 'নসব' পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পিতৃত্ব-পিতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক এবং মাতৃত্ব-মাতার সঙ্গে সন্তানের বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। এ বৈধ সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার অভিভাবকত্ব এবং ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত কতগুলো অধিকার ও কর্তব্যের জন্ম দান করে।[৪৪]

ইসলাম অবৈধ যৌন সম্ভোগ হারাম করলেও যিনার দ্বারা কোন মহিলা অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করলে সে সন্তানের হকের প্রতি যথেষ্ট সচেতন এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে তার মাকে দণ্ড প্রদান ইসলাম অনুমোদন করে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে– "সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, "গামিদ সম্প্রদায় থেকে একজন মহিলা রসূলুল্লাহ্ স. এর নিকট এসে বলল– হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– "তোমার জন্য আফসোস, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা কর। মহিলাটি বলল– আপনি কি আমাকে দিয়ে বার বার কথা বলাবেন, যেমন মায়েয ইবনে মালিককে দিয়ে বার বার কথা বলিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– তা কি? স্ত্রী লোকটি আল্লাহর রসূলকে জানালো সে যিনা করেছে এবং গর্ভবতীও হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন– তুমি? সে বলল, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ স. তাকে বললেন– তোমার পেটে যে সন্তান আছে তা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন– রসূলুল্লাহ্ স. ঐ মহিলাকে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত একজন আনসারের জিম্মাদারিতে থাকতে দিলেন, সে আনসারী প্রসবের পর ঐ মহিলাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স.-এর দরবারে এসে বললেন : গামেদিয়াহ্ তো বাচ্চা প্রসব করেছে। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন : এখনই তাকে তুমি রজম করো না, যতক্ষণ তার বাচ্চা তার মুখাপেক্ষী থাকে। অতঃপর (দুধ ছেড়ে দেয়ার পর) আনসারী ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়ে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! সে তো আমার নিকট পরিবারের মালিক হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন– তাকে রজম কর।"[৪৫]

---

৪৩. রহমান, মোঃ সিদ্দিকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৪৪. মু'মিন, নূরুল, *মুসলিম আইন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৪০৪

৪৫. মুসলিম, ইমাম, *আস্-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান ই'তিরাফ 'আলা নাফসিহি বিয্-যিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৮

অবৈধ শিশু সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মায়ের এবং মানবাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপধারা-১ এর উল্লিখিত সন্তানের ভরণ-পোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এই ধারার অধীনে ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হতে আদায় করতে পারবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবে সে সম্পদ হতে তা আদায় করতে পারবে।[৪৬]

এ আইন করার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের (২০০০) অপব্যবহার রোধে জাতীয় সংসদে ঐ আইনের সংশোধনকল্পে এই আইন প্রতিস্থাপিত হয়। এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ধর্ষণের ফলে জন্মলাভ করা সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। এই সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থানা গ্রহণ না করলে সে ক্ষেত্রে সরাসরি ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করা এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অভিযোগ অনুসন্ধানপূর্বক সরাসরি বিচার গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৭]

অবৈধ সন্তানের অভিভাবকত্ব বিষয়ে মুসলিম আইনের ভাষ্যে বলা হয়েছে, একমাত্র মা ও তার আত্মীয়-স্বজনই জারজ সন্তানের হেফাজত পেতে পারেন বা তার অভিভাবক হতে পারেন। অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন অনুযায়ী পিতা বর্তমান থাকলে, কেবল হেফাজতের অভিভাবক হবার অনুপযুক্ত বলে আদালত অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে না। তবে মুসলিম আইনে এমন কিছু নেই যাতে ধরা যেতে পারে যে, পিতা অনুপযুক্ত হলেও তার হেফাজতের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আদালত মা বা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করতে পারে। অপরদিকে পিতা উইলের মাধ্যমে নাবালক সন্তানের হেফাজতে অভিভাবকত্ব প্রদান করে যেতে পারেন।[৪৮]

জারজ সন্তানের হেফাজতের অধিকার মা ও তার আত্মীয়-স্বজনের ওপর ন্যস্ত হবে। মা কখন হেফাজতের অধিকার হারান বা নারী কখন নাবালকের তত্ত্বাবধান করতে অযোগ্য বলে গণ্য হয় তা নিম্নরূপ–

جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها .

৪৬. *বাংলাদেশ গেজেট*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ এর ৭নং ধারা।

৪৭. মিয়া, ছিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, *আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন*

৪৮. রফিউদ্দীন, *ইসলামিক আইন বিজ্ঞান ও মুসলিম*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৪, পৃ.১৩০-৩১

১. নাবালকের মাহরাম[৪৯] নয়, এমন পুরুষকে যদি মা বা অপর মহিলা বিয়ে করে। অবশ্য মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে পুনরায় এ অধিকার সৃষ্টি হবে। উল্লেখ্য যে, শিশুর মা বিবাহ-নিষিদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকেও বিয়ে করলে প্রকৃতপক্ষে স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে শিশুকে দেখাশোনা করা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন মা যদি কোন অপরিচিত পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সে হেফাজতের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

২. শিশুর পিতার সঙ্গে বিয়ে বহাল থাকাকালে সে যদি অন্যত্র বসবাস করে।

৩. সে যদি নৈতিকতা বিরোধী জীবন-যাপন করে অথবা পতিতা পেশা গ্রহণ করে।

৪. সে যদি শিশুর উপযুক্ত বা যথাযথ যত্ন নিতে অবহেলা করে।

৫. ধর্মান্তরিত হলে শিশুর অভিভাবক হিসেবে থাকতে পারবে না।[৫০]

জাতীয় শিশু নীতির 'চ' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাথ, দুস্থ ও আশ্রয়হীন পথশিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল প্রতিকূল অবস্থায় শিশুদের ত্রাণসামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।"[৫১]

বাংলাদেশ শিশু আইন, ১৯৭৪-এর ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- কোন গৃহ, নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান অথবা জীবনধারণের কোন দৃশ্যমান উপায় নেই, অথবা নিয়মিত ও যথাযথভাবে অভিভাবকদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না এরূপ কোন পিতা-মাতা বা অভিভাবক নেই, অথবা ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছে, অথবা দুস্থ অবস্থায় নিপতিত দেখা যায় অথবা যার পিতা-মাতা বা অভিভাবক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা কারাদণ্ড ভোগ করছে; অথবা যাকে সাধারণত কোন কুখ্যাত অপরাধী কিংবা পতিতার সঙ্গে পাওয়া যায়, যে তার পিতামাতা বা অভিভাবক নয়; অথবা এমন কোন বাড়িতে অবস্থান করছে বা যাতায়াত করছে যা পতিতাবৃত্তির কাজে কোন পতিতার ব্যবহারের অধীনে রয়েছে এবং সে উক্ত পতিতার শিশু নয়; অথবা যে প্রকারান্তরে কোন অসৎ সঙ্গে পতিত হতে পারে বা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বা অপরাধের জীবনে প্রবেশ করতে পারে। এসমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা যেতে পারে।[৫২]

---

৪৯. মাহরাম : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা কোন পুরুষের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) তাকে মাহরাম বলা হয়।

৫০. আবদুল করীম, শাইখ আব্দুল কাদের আল-জিলানী, *ছফওয়াতুল লাআলী ফী ইলমিল উসূলল ফিকহ*, বাগদাদ : ১৪০৬, পৃ. ২৫০

৫১. *স্ট্রিট চাইল্ডস ইন বাংলাদেশ*, ঢাকা : ২০০৬, পৃ. ১৯১

৫২. সিদ্দীক, মোঃ আবু বকর, *শিশু আইন ও অধিকার*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউজ, ১৯৭৪, পৃ. ২৬-২৭

সন্তানের ভরণ-পোষণের সময়সীমা

সন্তানের ভরণ-পোষণের সময়সীমা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ওপর কতদিন হবে, এটি একটি সংগত প্রশ্ন। এ সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মনীষীর মত হচ্ছে এই, পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্তই পিতা-মাতাকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এক শ্রেণীর মনীষীর মত এই, সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পত্তি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পিতার উপরই অর্পিত থাকবে।[৫৩]

এখন একটি প্রশ্ন হলো সন্তান কখন পূর্ণবয়স্ক হয়? এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো– .

কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের কিতাবে শিশুর বয়সসীমার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ইসলামের কিছু দিক-নির্দেশনা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। আয়েশা রা.-এর উক্তি থেকে যার কিছু প্রমাণ লাভ করা যায়। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে বিবাহ্ করেন, যখন আমার বয়স মাত্র 'ছয়' বছর। আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি 'নয়' বছরের মেয়ে।"[৫৪]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. লিখেন, "নবী স. আয়েশা রা.-কে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।"[৫৫]

মহানবী স. নিজে যখন আয়েশা রা-কে 'ছয়' মতান্তরে 'নয়' বছর বয়সে বিবাহ করলেন, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামে ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য কোন নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে কোন বয়সের ছেলে- মেয়েকে যে কোন বয়সে বিবাহ দেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী র. ইবনে বাত্তালের নিম্নোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করেন– "ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার মেয়ের বিবাহ্ দেয়া সম্পূর্ণ জায়িয-বৈধ, সে মেয়ে দোলনায় শায়িত শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়িয হবে না, যতক্ষণ তারা যৌন কার্যের জন্য পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ্য সম্পন্ন না হয়। পিতার পক্ষে তার কুমারী (নাবালেগ) মেয়েকে বিবাহ্ দেয়া জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ফকিহ্গণ একমত।"[৫৬]

---

৫৩. Emperor v. Ayshabai, (1094), P. 6; Bom L.R. P. 538.

৫৪. মুসলিম, ইমাম, *আস্-সহীহ্*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, অনুচ্ছেদ : জিউয়াজু তাজবীযুর আবিল বিকরিস সগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১৪

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسعة سنين

৫৫. আইনী, বদরুদ্দীন, *'উমদাতুল কারী*, সাহারানপুর, ইউপি: যাকারিয়া বুক ডিপো, ১৪২৪, খ. ২০, পৃ. ৭ إن النبي صلعم تزوج عائشة و هي صغيرة و كان عمرها ست سنين

৫৬. নববী,আবূ যাকারিয়্যাহ মহীউদ্দীন ইবনে শারফ, ইমাম, *শারহ্ সহীহ লি মুসলিম*, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৫৬

কাজেই মেয়েদের বা ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে কোন বয়স নির্দিষ্ট করা করা যায় না। এজন্য যে, সব মেয়ে শারীরিক অবস্থা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান হয় না। এমনকি বংশ-গোত্র, পারিবারিক জীবন-মান ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এ কারণে কোন এক নীতি বা কোন ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না। কাজেই ছেলে-মেয়ের বিবাহের জন্য কোন বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং ঐ নির্ধারিত বয়স সীমার পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তা ছাড়া বিয়ে বলতে যদি স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন ও এতদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা তো ছেলেমেয়েদের পূর্ণ বয়স্ক বালেগ-বালেগা অর্থাৎ সাবালক হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় না। তবে বিবাহ বলতে যদি শুধু আক্দ ও ইজাব-কবুল বোঝায় তাহলে তা যে কোন বয়সেই হতে পারে। এমনকি দোলনায় শোওয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতা বা বৈধ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। ইসলামী শরীঅতে এ বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এবং এতে অশোভনও কিছু নেই। আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস্-সিবায়ী লিখেন, "চারটি মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের ইজতিহাদী রায় এই যে, 'বালেগ' (সাবালক) হয়নি– এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও বৈধ।"[৫৭]

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী স.-এর যুগে তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলির ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য। রসূলুল্লাহ স.-এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে শিশুদের মুকাল্লাফ- শরী'আতের বিধিবিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়স সীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন : ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের আদেশ দিবে। দশ বছর হলে এবং সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[৫৮]

এ হাদীসের বক্তব্য থেকে শরীয়তের দৃষ্টিতে শিশুর নিম্নতম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ শিশু শরীয়ত পালনের জন্য মুকাল্লাফ বা বাধ্য হবে দশ বছর বয়সে।

ফিক্হবিদদের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু তখন সাবালক হবে- যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া শুরু হবে। আর এর নিম্নতম বয়স সীমা বলা হয়েছে কমপক্ষে 'নয়' বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোন বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে

---

৫৭. আস্ সিবায়ী, ড. মুস্তফা, *আল্-মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল-কানুনি*, তা.বি., পৃ. ৫৭

৫৮. আবু দাউদ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সালাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫৯

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

না।[৫৯] এ ব্যাখ্যা থেকেও মেয়ে শিশুর বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালকত্বের নিম্নতম বয়স 'নয়' বছর। শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পণের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। উপরিউক্ত নিদর্শন দেখা গেলে ছেলে-মেয়ে শিশুত্ব থেকে শরীয়তের মুকাল্লাফ হয়ে থাকে অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ হয় এবং শরীয়তের বাধ্যবাধকতা আরোপ হয়। তখন আর সে শিশু শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকে না।[৬০]

সাবালকত্বের সীমা নির্ধারণের আলোচনায় ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী র. ৭টি মত উল্লেখ করেছেন–

১. শিশুর বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থ্যবান হওয়া।

২. মনীষী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আল-জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবালকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা, পাগল যা করে, তা থেকে বিরত নিজেকে রাখতে সক্ষম।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং শরীয়তে পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

৪. 'আল্লামা ছুমামা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্, রসূল, কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়- তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ যুক্তিবিদ-এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিকহবিদ-এর মতে- দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোন কোন ফিকহবিদ শিশুর সাবালত্বের বয়স সীমা ১৭ বছর মনে করেন।

৭. স্বল্প সংখ্যক পণ্ডিতগণের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ, সাবালকত্ব লাভ করবে না।[৬১]

---

৫৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩৬; *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ২০৭

৬০. মু'মেন, নূরুল, *মুসলিম আইন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪২-১৪৩

৬১. আবুল হাসান, আলী ইবনে ইসমাঈল আল-আশআরী, ইমাম (মূল), মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আবদুল হামীদ সম্পাদিত, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন,* খ. ২, পৃ. ২৩৫; *মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল মাসরিয়্যাহ,* বার্ষিক জার্নাল, আল-কাহেরা : আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯ হি., পৃ ১৭৫

ইবনে শুবরুমা ও আল্-বাত্তী অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি করে বলেন, ছোট বয়সের ছেলে-মেয়ের বিবাহ প্রদান বৈধ নয়। আর তাদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে উকীল হয়ে যে সব বিবাহ সম্পন্ন করে থাকেন, তা সম্পূর্ণ বাতিল, তাকে বিয়ে বলে ধরাই যায় না।[৬২]

ইমাম আবু হানীফা র. বলেছেন : যখন কোন সন্তানের বয়স ১৫ বছর হবে অথচ তার থেকে কোনপ্রকার আলামত প্রকাশ হবে না তখন তাকে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে। তবে ইমাম শাফে'ঈ ও আবু ইউসুফ র.-এর মতে তার কাছে সব মাল সোপর্দ করা যাবে না। তারা কুরআনের আয়াতের দলীল দিয়ে বলেন, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ এ আয়াত যেহেতু রহিত হয়নি সুতরাং এ হুকুমও বলবৎ আছে।[৬৩]"

হাদীসের এক বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, সাবালক হওয়ার বয়স হলো ১৫ বছর। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রা. বলেন : তার যখন বয়স ১৪ বছর তখন তাকে রসূলুল্লাহ স. উহুদ যুদ্ধের জন্য অনুমতি দেননি। তবে যখন তার বয়স ১৫ বছর তখন তাকে খন্দকের যুদ্ধের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৪]

সকল ইমামের মতে গোলাম প্রাপ্ত বয়স্ক হয় ১৯ বছর বয়সে।[৬৫]

নারী প্রাপ্ত বয়স্ক হয় হায়েজ অথব স্বপ্নদোষ হলে। আর তা যদি না হয় তাহলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময় হল ১৭ বছর। তথা কারো যদি ১৭ বছর পর্যন্ত কোন হায়েজ না হয় তাহলে তাকে ১৭ থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক বলে ধরে নেয়া হবে।[৬৬]

প্রকৃতপক্ষে শরীয়তে বিবাহের আদেশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান, উপদেশ এ কথারই সমর্থক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দেয়ার বাস্তব কোন কল্যাণ নেই। বরং আছে অনেক জটিলতা, তিক্ত সমস্যা ও বিপর্যয়। শিশু বয়সে বিবাহের কারণে সন্তানদের জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে, সেজন্য বর্তমান সমাজ-মানসে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এর প্রতি প্রতিরোধ জেগে উঠেছে। এ কাজকে আজ অনেকে ভাল ও সমর্থনযোগ্য মনে করতে পারছে না। তাই বলে বিবাহের একটা

---

৬২. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯

৬৩. আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ. ২৮, তা. বি. পৃ. ৪৯৮

৬৪. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : বুলূগুস সিবইয়ান ওয়া শাহাদাতাহুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

احرثنى بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

৬৫. *বাহরুর রায়েক শরহি কানযুদ দাকাইক*, তা. বি. খ. ২১, পৃ. ১১১

৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ১১২

নির্দিষ্ট বয়স ধার্য করা এবং তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠানকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করে দেয়া; এমনকি যদি কেউ তা করে সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে জেল-জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মানবীয় নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এ কাজ সমীচীন নয়।

সন্তানদের বয়ঃসন্ধির একটি যুক্তিপূর্ণ ও আধুনিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে স্যার রোল্যাণ্ড উইলসন একটি সুন্দর ও যুগোপযোগী কথা বলেছেন। আর সেটি হলো : যেহেতু ভরণ-পোষণ কোন ব্যতিক্রমমূলক বিষয় নয়, অতএব তার জন্য নাবালকত্বের বয়সটিকে আঠার বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।[৬৭]

সন্তানকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি শিক্ষার সকল প্রকার দায়িত্বও তত্ত্বাবধায়কগণের। কেননা কেবল খাওয়া-পরা দিয়ে লালন-পালন করলেই পিতার দায়িত্ব পালন হয় না। বরং তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যও অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যোগ্য নাগরিক তৈরি করা পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। যেমন আবূ কিলাবা রা. বলেছেন : "যে লোক তার ছোট শিশু সন্তানদেরকে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করে, যাতে করে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, তাদের বৈষয়িক উপকার দিবেন, সে লোক অপেক্ষা পুরস্কার পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক অগ্রসর আর কেউ হতে পারে না।[৬৮]"

অর্থাৎ, সন্তানদের এমন গুণে তৈরি করে তোলা, যা দ্বারা আল্লাহ্ তাদের অনেক উপকার দেবেন এবং জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারসমূহে তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মুখাপেক্ষীহীন করে দেবেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ এবং যে এ কাজ করবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার দান করবেন। আনাস রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নারী ও পুরুষের)-এর উপর অবশ্য কর্তব্য।[৬৯]"

---

৬৭. এ্যাংলো মোহামেডান ল', ধারা নং-১৪০ ও ১৪২

৬৮. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : বাবু ফাদলিন নাফকাতি আলাল 'ইয়ালি, প্রাগুক্ত

قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم

৬৯. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস্-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল উলামায়ি ওয়াল হাচ্ছি আলা ত্বলাবিল ইলমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯১

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب

বস্তুত ছেলেমেয়ে হচ্ছে পিতামাতার কাছে আল্লাহর আমানত। তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস, মন ও মগজ, চরিত্র ও অভ্যাস, জীবনযাত্রার ধারা ইত্যাদিকে সঠিকরূপে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করা পিতা-মাতারই কর্তব্য। এমতাবস্থায় সন্তানদেরকে যদি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা না হয়, যার ফলে তাদের মন-মগজ সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে পারে, তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হতে পারে, দীন-ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন ও কাজকর্ম সম্পাদনে পূর্ণ আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলে কিছুতেই এ আমানতের হক আদায় হতে পারে না, নিজেদেরও সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। এ দিকে লক্ষ রেখে বলা যায়, আঠার বছর পর্যন্ত একটি সন্তান যদি লেখাপড়া করে তাহলে সে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এইচ.এস.সি পাশ করতে পারে। তাই পিতা-মাতা প্রতিটি সন্তানকে অন্ততপক্ষে এইচ.এস.সি পাশ করানোর প্রত্যেক দায়িত্ব নিতে পারেন।

উপসংহার : সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর বলা যায় যে, সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় উত্তম সাদাকাহ তুল্য। আর এ ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সন্তানের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে একমাত্র দায়-দায়িত্ব হলো তার পিতার ওপর। পিতার অবর্তমানে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় সন্তানের মাতার ওপর। এরপর তার নিকটাত্মীয়গণের উপর। তাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধানেরই হলো সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। আর এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে দরিদ্র, অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন-পালনের খরচাদি রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সরবরাহ করবেন। অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে মূলকথা হলো, জন্মের জন্য শিশু নিজে দায়ী নয়। জন্মকে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শিশুর জন্মস্থান বা কোন পরিবারে জন্মাবে, এ ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রকাশ বা কার্যকর করতে পারে না। সুতরাং কোন সন্তান তার পিতামাতার বিবাহ বন্ধনের বাইরেও যদি জন্ম নেয় সে জন্য তার কোন অপরাধ নেই। সে জন্য তার পিতা-মাতা অপরাধী হবে, পিতা-মাতা শাস্তি ভোগ করবে, শিশু নয়। শিশু সমাজের কাছে সকল প্রকার নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণের অধিকার রাখে। এজন্য তাদেরও সঠিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মাতা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে অন্যথায় রাষ্ট্রই এ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর শিশুর ভরণ-পোষণের নির্দিষ্ট সীমারেখা হলো পুত্র সন্তানের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ হওয়া পর্যন্ত।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৭
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১১

মানবাধিকার ও ইসলাম

মোহাম্মদ মুরশেদুল হক*

[সারসংক্ষেপ : সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ চলছে দানবীয় রাজত্ব। শৃংখলিত মানবতা প্রহর গুনছে মুক্তির। কিন্তু মুক্তির পরিবর্তে সৃষ্টি হচ্ছে নব নব সংকট। বাড়ছে অশান্তি। মরছে বনী আদম। ধ্বংস হচ্ছে জনপদ। ঠিক এমনি এক সমস্যা সংকুল পরিবেশে অজ্ঞানতা, অমানবিকতা, নির্লজ্জতা ও হিংস্রতার অষ্টোপাশে আবদ্ধ মানব সভ্যতাকে রাহুমুক্ত করার এবং নতুন জীবনদানের অঙ্গীকার নিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.। তাঁর সম্পাদিত মহাবিপ্লব সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে আজও এক বিস্ময়। সমগ্র বিশ্বের অকৃত্রিম দরদীবন্ধু ও অভিভাবক-এ মহান ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় দর্শনের স্পর্শে অভিভূত হয়েছিল সমকালীন সমাজ ও পৃথিবী। কুরআনের ভাষায় তার সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা মানবসভ্যতা। অথচ পবিত্র কুরআনে মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। মহানবী স.-এর হাদীসে রয়েছে, মানবাধিকারের অসংখ্য উদাহরণ। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রবন্ধে মানবাধিকারের পরিচয়, পরিধি, মহানবী স.-এর গৃহীত পদক্ষেপ এবং বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।]

মানবাধিকার ও প্রাসঙ্গিক কথা : আধুনিক বিশ্বে মানবাধিকার একটি বহুল আলোচিত বিষয়। মানবাধিকার বলতে সরলার্থে মানুষের সহজাত অধিকারই মানবাধিকার হিসেবে পরিচিত। যে সব মানবিক অধিকার ব্যতীত মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে মর্যাদাসহ জীবনধারণ করতে পারে না, মানবিক গুণাবলি ও বৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় না সাধারণত সেগুলোই মানবাধিকার হিসেবে গণ্য।[১] যুগে-যুগে দেশে-দেশে বিত্তবান, ক্ষমতাধর শাসক শ্রেণী কর্তৃক দুর্বল, ক্ষমতাহীন, বিত্তহীন জনগোষ্ঠী শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। এ শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার মুক্তির লক্ষে আল্লাহ্ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন যাঁদের প্রত্যেকেই দানবরূপী শাসক শ্রেণী কর্তৃক অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

---

* **সহকারী অধ্যাপক,** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

১. রহমান, মুহম্মদ মতিউর, "ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার" *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন, ২০০৩, পৃ. ৩৩

আল্লাহর নবীগণের সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পরও স্বৈরাচারী, দাম্ভিক শাসক শ্রেণী সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকারে কুঠারাঘাত করছে, বিশ্বমানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করছে, নির্বাসিত করেছে শান্তি-সমৃদ্ধিকে। তাই চরম উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষগুলো বাধ্য হয়ে তাদের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারে সফল সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

মানবাধিকার সম্পর্কে তদানীন্তনকালের ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবী সর্বপ্রথম খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ২১৩০-২০৮৮ সালে 'ব্যাবিলনীয় কোড বা 'হামুরাবী কোড' এর মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টিকে আইনগত রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন।[২] খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মহানবী স. মানুষকে আল্লাহর খলীফা অভিধায় অভিহিত করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন অতঃপর তিনি আল-কুরআনের নির্দেশনা এবং স্বীয় বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল।[৩]

মানবাধিকার ও শাব্দিক পরিচিতি : 'মানবাধিকার' শব্দটি অধুনাবিশ্ব প্রেক্ষাপটে বহুল আলোচিত বিষয়। এটা একটি যৌগিক শব্দ যার ইংরেজী পরিভাষা হল "Human Rights". "Human rights"-এর পরিচয়ে কোথাও বলা হয়েছে– One of the basic rights that everyone has to be treated fairly and not in crual way, especially by their government[৪] এটি মূলত ফরাসী শব্দ হতে উৎপন্ন। অর্থ হল– মানুষের অধিকার[৫] Thomas Paine সর্বপ্রথম ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১৭৮৯ সালে গৃহীত Rights of Man ঘোষণার জন্য Droits de L'home শব্দটি ব্যবহার করেন যা Mrs. Elcanor Roosevelt- এর প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত The Universal Declaration of Human Rights এ 'Human Rights' বা মানবাধিকার পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়।[৬] যার আরবী পরিভাষা "হক্ব বা হুকুক" যা কুরআন-সুন্নাহে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবাধিকার পরিভাষাটি কখনো Basic Human Rights, কখনো Fundamental Rights আবার কখনো Birth Rights of Human being ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৭]

---

২. রেবা মণ্ডল ও মো. শাহজাহান মণ্ডল, *মানবাধিকার আইন-সংবিধান ইসলাম*, চট্টগাম : ১৯৯৯, পৃ. ৪

৩. ড. আ.ক.ম আব্দুল কাদের, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ.) প্রেক্ষিত বর্তমান বিশ্ব, *আত্-তাকবীর*, চট্টগ্রাম : সীরাতুন্নবী সংখ্যা ৮, ২০০২, পৃ. ৪৭

৪. A.S Hornby, *OXFORD ADVANCED LEARNER'S DICTIONARY*, London : Oxford University Press, Sixty rd, 2002, p. 635

৫. আব্দুন নূর, বিশ্বমানবাধিকার ঘোষণা, ইসলাম ও গণতন্ত্র, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ফোরাম কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১৯৯৪ সালে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, পৃ. ১

৬. Thomas W. Wilson, "A Bedrock Consensus of Human Right's" in H. Henkin (ed), *Human Dignity : The Internationalization of Human Rights* : 1979, P. 48

৭. ড. আ.ক.ম. আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

মানবাধিকার-এর বিকাশ : মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ধন-সম্পদ, জেন্ডার নির্বিশেষে সমভাবে দেখে তার সহজাত ও স্রষ্টা প্রদত্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই হচ্ছে 'মানব মর্যাদা'। মানুষের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা, সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভার সৃজনশীল বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার স্বত্বই হচ্ছে মানবাধিকার।[৮] মানুষের এই অধিকার তার জন্মগত এবং মানবিক মূল্য ও মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। Encyclopaedia Britannica-তে মানবাধিকারকে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মানুষের জন্মগত অধিকার দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "Rights thought to belong to the individual under natural law as a Consequence of his being human"।[৯]

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮-এর প্রস্তাবনাতে মানবাধিকারকে মানুষের সহজাত ও অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার হিসাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "...recognition of the inherent dignity of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world"[10] The Social work Dictionary-এর মতে, "Human Rights are the opportunity to be accorded the same prerogatives and obligations in Social fulfillment as are accorded to all others without distinction as to race, sex, language or religion"[১১]

মানবাধিকার কেবল মানুষের মৌল-মানবিক চাহিদা (Basic human needs) এর পূরণই নয় বরং তা হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিভার বিকাশ, চিন্তা (thoughts), বিশ্বাস (believe) ও সৃজনশীলতার লালন। বলা হয়েছে, "Human rights are concerned with the dignity of the individual-the level of self-esteem and secares personal identity and promotes human community[১২] সমকালীন বিশ্বে মানবাধিকার এর এই ধারণা বিকাশ লাভ করেছে প্রধানত পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজনীতি এবং বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিকতাবাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে জাতিসংঘের উদ্যোগে।

মানবাধিকার ও তার পরিধি : মানবাধিকার বলতে মানুষের সেই সব স্বার্থকে বুঝায় যা অধিকারের নৈতিক বা আইনগত নিয়মনীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাষ্ট্র কর্তৃক এর নাগরিকদের জন্য স্বীকৃত ও প্রদত্ত কতিপয় সুযোগ-সুবিধাকে

---

৮. হাসান, ড. মোস্তফা, *মানবাধিকার ও হযরত মুহাম্মদ (দ.) একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, পৃ. ৪৪

৯. *The New Encyclopuedia Britunnica*, USA : Funded in 1768, 15th editim , VOL-5, P-200

১০. M. Moskowitx, *Human Rights and the world order* USA : Occana publication, New York, Appendix 1, P. 199

১১. Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, Nasw Press, 3d editia, 1995, P-173

১২. হাসান, ড. মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

মানবাধিকার বলে যেগুলো ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।[১৩] মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হওয়ার কারণে তার পক্ষে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই সামাজিক জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির ও বলিষ্ঠতার জন্য সমাজের এক সদস্যের প্রতি অন্য সদস্যের অনেকগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এই দায়িত্বই হচ্ছে মূলত অধিকার। সুতরাং মানুষের প্রতি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহই হল মানবাধিকার। জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মানবাধিকার হল মানুষের এমন কতগুলো জন্মগত অধিকার ও অনস্বীকার্য চাহিদা, যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেককে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য অতীব প্রয়োজন এবং সেগুলো মানুষের আত্মিক চাহিদা মেটায়।[১৪] মূলত মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য ও অলংঘনীয় অধিকার হল মানবাধিকার। এসব অধিকার তিনভাগে বিভক্ত–

এক : অর্থনৈতিক অধিকার, যথা– ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, জীবিকা অর্জন, সম্পত্তির মালিকানা লাভ ও সংরক্ষণ, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, যোগ্যতানুযায়ী কর্মসংস্থান এবং ধনীদের সম্পদে গরীব অনাথ ও নিরন্ন মানুষের অধিকার প্রভৃতি।

দুই : সামাজিক অধিকার, যথা- জাতি-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সমঅধিকার, মতামত প্রকাশ, জান-মালের নিরাপত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক তথা-নাগরিক অধিকার, সভা-সমিতি, সংগঠন ও জনমত গঠনের অধিকার, অবাধে নিজের ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের অধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার লাভের অধিকার এবং বিবাহ-তালাক ইত্যাদির অধিকার।

তিন : নৈতিক অধিকার, যথা-অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা, শ্লীলতার প্রসার ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ, সৎকর্মের বিকাশ ও অসৎকর্মের বিনাশ, পিতা-মাতা ও বয়ো:জ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন, সমাজের দরিদ্র, অসহায়, বিধবা, ইয়াতীম, অধিকার বঞ্চিত-মজলুম মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, অতিথি-মুসাফিরদের আদর-আপ্যায়ন এবং সকল মানুষের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি।[১৫] বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকারকে বুঝায় যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় (The Universal Declaration of Human Rights) উল্লেখ করা হয়েছে। ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই ঘোষণায় ২৫টি মানবাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি নাগরিক ও রাজনৈতিক এবং ৬টি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক।[১৬]

---

১৩. রেবা মণ্ডল ও মো. শাহজাহান মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৪. *জাতিসংঘ মানবাধিকার পঞ্চাশটি প্রশ্ন ও উত্তর*, ঢাকা : জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, পৃ. ০৫

১৫. রহমান, মুহম্মদ মতিউর, *ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৬. আব্দুল কাদের, ড. আ.ক.ম, *মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স) প্রেক্ষিত বর্তমান বিশ্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

বিশ্বপ্রেক্ষিত ও মানবাধিকার : ১৮'শ শতকের ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো বলেন, Man is born free, but everywhere he is in Chain, অর্থাৎ, মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃংখলাবদ্ধ।[১৭] যুগে যুগে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের ওপর সবলদের নিয়ন্ত্রণ এবং মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণী কর্তৃক বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর উপর শাসন-শোষণের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বহুবিধ নিয়ম-নীতি আরোপের কারণে সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে জড়িত অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। ফলে মানবিক বিকাশের স্বাভাবিক ধারা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সংগ্রাম করতে হয় শৃংখল মুক্তি তথা মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য।

"রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বেই কি অধিকারের জন্ম হয়েছে না কি রাষ্ট্রই অধিকার সৃষ্টি করেছে" রাজনীতি বিজ্ঞানের এটি বিতর্কিত বিষয়। John Locke এর মতে, মানুষ স্বভাবতই কিছু অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকারসহ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার মানুষের অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।[১৮] আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে প্রাক-রাষ্ট্রীয় যুগেও মানুষ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) ভোগ করতো। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র কেবল সেই সব অধিকারকে অনুমোদন, সংরক্ষণ ও ভোগের নিশ্চয়তা দিয়েছে মাত্র। পক্ষান্তরে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করার এই ধারণার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মানুষের পক্ষে কোন অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। কেননা, রাষ্ট্র অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা না দিলে সে অধিকার অর্থহীন। সুতরাং রাষ্ট্র তথা নাগরিকদের জন্য বহুবিধ রাষ্ট্রীয় আইনই অধিকার সৃষ্টি করে এবং তা ভোগ করার নিশ্চয়তা দেয়।[১৯]বস্তুত মানবাধিকার ব্যক্তির মর্যাদা সম্মানের সাথে জড়িত একটি বিষয় যা মানব সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকে প্রকাশ করে। অতএব এটি কেবল ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয়, গোটা বিশ্ব সমাজের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন। সুতরাং একে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব কেবল ব্যক্তির নয়, বিশ্বসমাজেরও। আর প্রতিটি রাষ্ট্র বিশ্বসমাজের এক একটি অংগ হওয়ার কারণে এই মহান দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরও বর্তায়।

মানবাধিকার আইন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : মানবাধিকারের ধারণা যেহেতু মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পোষণ করে আসছে, তাই এটি সংরক্ষণের বিষয়েও বিশ্বসমাজ তাদের চিন্তায় ত্রুটি করেনি। অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন হল ব্যাবিলনের রাজা হাবুরাবী কর্তৃক প্রণীত "ব্যাবিলনীয় কোড" বা 'হামুরাবী কোড' (প্রণয়নকাল-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২১৩০-২০৮৮ সাল)। লিখিত আইনের সূচনা হিসাবে এই কোড বিশেষ মূল্য বহন করে। এতে মানবাধিকার

১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. রহমান, মুহাম্মদ হাবীবুর, অধিকার, *কর্তব্য ও উন্নয়ন' মানবাধিকার ও উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা : ১৯৯১, পৃ. ৬৩-৬৪

সংরক্ষণের কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সরকার পরিচালনা, নির্বাচন, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নাগরিকদের অংশগ্রহণের অধিকার প্রয়োগের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।[২০] খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে মানুষের অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মহানবী স.-এর সুন্নাহ ও হাদীস এবং "মদীনা সনদ" ও "বিদায় হজ্জে" প্রদত্ত মহানবী স.-এর ভাষণ মানবাধিকার তথা মানুষের অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছে।

কিন্তু পরবর্তীতে মানুষ যখন ইসলাম এবং মহানবী স.-এর শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয় এবং মানুষ যখন শাসক শ্রেণী হতে তাদের প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, তখন তারা অধিকার আদায়ে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়েছে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে বাধ্য করেছে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে। ফলে শাসক শ্রেণী ও জনগণের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে বিভিন্ন চুক্তি ও দলীল, যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মানুষের অধিকার। ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে আইবেরিয়ান-ব-দ্বীপে সামন্ত প্রভু ও অভিজাত ব্যক্তিদের এক সভায় রাজা আলফসনের নিকট থেকে অভিজাত শ্রেণীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের নিরাপত্তা, জীবনের মর্যাদা, বাসস্থান ও সম্পদের অলংঘনীয়তা প্রভৃতি কিছু অধিকার আদায় করে নেয়।[২১] হাঙ্গেরীর রাজা দ্বিতীয় এন্ড্রু ১২২২ খ্রিস্টাব্দে 'স্বর্ণ আদেশ' দ্বারা ঘোষণা দেন, তিনি আমীর ওমারা ও অভিজাত শ্রেণীর জন্য বেশ কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি অধিকারসমূহের এক দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করেন এবং তা কার্যকর করার পদ্ধতিও ঘোষণা করেন।[২২]

ইংল্যাণ্ডে মানবাধিকার বিকাশের ক্ষেত্রে ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা জন কর্তৃক সম্পাদিত Magna Carta কে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিকভাবে এই চুক্তি রাজা ও ব্যারনদের মাঝে সম্পাদিত হলেও ৬৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই দলীলকে পরবর্তীতে Charter of English Liberties এবং বর্তমানে মানবাধিকার ও মুক্ত সরকারের ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[২৩] সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নাগরিকদের সনাতন অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় তারই ফলশ্রুতিতে প্রণীত হয় ১৬২৮ সালে The Petition of Rights ও ১৬৮৯ সালে The Bill of Rights নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। মানবাধিকার সম্বলিত এ দু'টি দলীল একদিকে যেমন রাজার একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতাকে খর্ব করেছে, অপরদিকে পার্লামেন্ট ও আদালতের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। Lord

---

২০. বেরা মণ্ডল ও মো. শাহজাহান মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. Bari, Dr. M. Ershadul, *International Concern for the Promotion and Protection of Human Rights,* Dhaka : Dhak University Studies Part F, VOL II (i) P-21

Chathan উক্ত Magna Carta, The Pitition of Rights ও The Bill of Rights এই তিনটি দলীলকে The Bible of the English Constitution নামে অভিহিত করেছেন।[২৪]

১৮শ শতকের বিভিন্ন দার্শনিকের লেখা ও রচনায় এবং ১৬৮৮ সালের ইংলিশ বিপ্লব ও এর ফসল ১৬৮৯ সালের The Bill of Rights উত্তর আমেরিকা ও ফ্রান্সে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রেরণা যোগাতে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। ব্রিটিশ কলোনী আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজার শাসন-শোষণ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের জয় লাভের ফলে আমেরিকাবাসী ১৭৭৬ সালের ১২ জুন ভার্জিনিয়াতে একটি Bill of Rights গ্রহণ করে, যার ঘোষণপত্রে উল্লেখ করা হয়ঃ "All men are by nature fully free and Independent, And have certain Inherent rights, namely, the enjoyment of life and liberty, will the means of acquiring and possessing property and obtaining happiness."২৫ এর মাত্র ২১ দিন পর ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার ১৩টি কলোনীকে নিয়ে The Declaration of Independence তথা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে মানবাধিকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়– "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain in alienable rights, that among these rights are life, liberty and pursuit of happiness." এতে আরো বলা হয়, এই সব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জনগণ যে সরকার তৈরি করে সেই সরকার যদি এই সব অধিকার খর্ব করে তবে সেই সরকার উৎখাত করে নতুন সরকার গঠন করা জনগণেরই অধিকার।[২৬]

আমেরিকার The Declaration of Independence এর ১৩ বছর পর ১৭৮৯ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের বিপ্লবীরা স্বৈরাচারী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা ইতঃপূর্বে যেইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট "Declaration of Rights of man and of the citizen" নামক ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র সম্পাদন করে। এতে বলা হয়– "Men are born and remain free and equal in rights."[২৭] এতে স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি অধিকারের উল্লেখ ছিল।[২৮] আমেরিকা ও ফ্রান্সের মানবাধিকারের এই প্রভাব ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে পুরো ইউরোপীয় মহাদেশকে গ্রাস করে ফেলে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মানবাধিকার বিষয়টি স্থান করে নেয়।[২৯] ক্রমে মানবাধিকারের এই আন্দোলন এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

---

২৪. রেবা মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৬. Bari, Dr. M. Ershadul, Ibid, P-22,
২৭. Declaration of Rights of Man and of the Citizen, Article-1
২৮. Ibid, Article-2
২৯. Bari, Dr. M. Ershadul, Ibid, P-23-24

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী স. কর্তৃক গৃহিত বাস্তব পদক্ষেপ

১. হিলফুল ফুযুলের প্রতিষ্ঠা : মহানবী স.-এর আবির্ভাব ঘটে আরব দেশে এক বেদুঈন অঞ্চলে, যেখানে অতীতে কখনো নগর জীবনের নান্দনিকতা ও সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি।[৩০] এখানকার জাহিলী পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত সমাজে জাহিলিয়্যাত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মহানবীর স. আগমনের সমসাময়িককালে মক্কার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল আবূ জাহল, আবু লাহাব, উতবাহ, শায়বাহ প্রমুখের হাতে। মানবাধিকার সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণা ছিল না বলে প্রতিনিয়ত তাদের হাতে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত ও পর্যুদস্ত হচ্ছিল। এমনি এক বৈরী পরিবেশে আবির্ভূত হওয়ার পর মহানবী স. লক্ষ করেন যে, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু সন্তান পিতৃহারা হয়, অগণিত নারী হয় স্বামী কিংবা পুত্র হারা। মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হয় এই যুদ্ধ-বিগ্রহে। অসহায়-দুঃস্থ-দুর্গত লোকজন বঞ্চিত হয় তাদের প্রাপ্য অধিকার হতে, ইয়াতীম-নিঃস্ব বিধবাও বঞ্চিত হয় তাদের ন্যায্য পাওনা হতে, অত্যাচারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ দুর্বল অসহায় লোকদের সদা সন্ত্রস্ত করে রাখে। সুতরাং এই বিপর্যয়কর অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য মাত্র ১৭ বছর বয়সে মহানবী স. মানবাধিকারের কতিপয় ধারা সংযোজনপূর্বক 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেন, যার মূল বক্তব্য ছিল– সমাজ হতে অশান্তি দূর করা, পথিকদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং কোন অত্যাচারীকে মক্কায় আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়া।[৩১]

২. বায়আতুল আকাবার শপথ : হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে মহানবী স. হজ্জ উপলক্ষে ইয়াছরিব হতে মক্কায় আগত খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে আল্‌-আকাবা নামক স্থানে যে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ করান তাতে মানবাধিকারের মৌলিক কতিপয় ধারা লক্ষ্য করা যায়। মহানবী স. বলেন– "তোমরা আমার হাতে এ বিষয়ে আনুগত্যের শপথ (বায়আত) কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা-ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে মনগড়া কোন মিথ্যা অপবাদ দিবে না।"[৩২] মহানবী স.-এর উক্ত বাণীতে ধর্ম পালনের অধিকার, সম্পদের অধিকার মান-মর্যাদাও সম্ভ্রমের অধিকার এবং জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

৩. মদীনা সনদের প্রবর্তন : ৬২২ খ্রি. মহানবী স. যখন মক্কা হতে ইয়াছরিব তথা মদীনায় হিজরত করেন তখন মদীনায় তিন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বাস করতো–

---

৩০. Al-Aggad, Abbas Mahmud *Athr-al-Arab Fial-Hadarat-al Uru bjyah* Egypt : Dar al-Ma-rif. P- 5-6

৩১. আব্দুল, কাদের, ড. আ.ক.ম, *সীরাতু সায়্যিদিল মুরসালীন*, চট্টগ্রাম : ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০০১. পৃ. ৩৫-৩৬

৩২. Abu-Abdullah Ismail Bukhai, *As Sahih* Dilhi : Kutub Khana Rasidiyah, 1977, VOL-1, P-7.

এক : একনিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়
দুই : মদীনার আদি মুশরিক তথা পৌত্তলিক সম্প্রদায় এবং
তিন : মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায়।

এ ধরনের একটি বহু জাতিক ও বহুধর্ম ভিত্তিক অঞ্চলে হিজরত করে মদীনার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রধান হিসাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে মহানবী স. হিজরতের প্রথম বর্ষে একটি লিখিত সনদ জারী করেন। ইতিহাসে এটি 'মদীনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ।[৩৩] আরবী ভাষায় জারীকৃত এই সনদে ৫৩টি ধারা বিদ্যমান ছিল, যার অনেকগুলো ধারাই ছিল মানবাধিকার বিষয়ক। এতে উল্লেখ করা হয় যে, মদীনায় বসবাসকারী সকল ইয়াহূদী এবং ইয়াছবির ও কুরাইশের সকল মুসলিম জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং সকলে সমান নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ভোগ করবে। পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে প্রচলিত প্রথা ও ন্যায়বিচার মোতাবেক রক্তপণ আদায় করতে হবে, কেউ বন্দী হলে ন্যায়বিচার মোতাবেক তাকে মুক্ত করতে হবে, দুর্বল ও অসহায়কে আশ্রয় দেয়া হবে এবং সর্বতোভাবে তাদের রক্ষা করা হবে, ঋণগ্রস্তদের ঋণের বোঝা লাঘব করা হবে, অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ এবং সমাজে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সকলে অবস্থান গ্রহণ করবে, তারা কারো সন্তান কিংবা নিকটাত্মীয় হলেও। কোন অন্যায়কারীকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না এবং কোন প্রকার আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, মহানবী স.-এর পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত কেউ যুদ্ধে জড়িত হতে পারবে না, একজনের অপকর্মের জন্য অন্যজনকে দায়ী করা যাবে না, ইয়াহুদীদের মিত্ররাও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, বহিঃশত্রু দ্বারা মদীনা আক্রান্ত হলে একে রক্ষা করার জন্য সকলে সম্মিলিত প্রায়াস চালাবে।[৩৪] এভাবে মদীনা সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধানের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই প্রথম। সমাজের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম ও ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে রচিত মদীনা সনদ বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান বা শাসনতান্ত্রিক সরকারের মর্যাদা লাভ করে।[৩৫]

---

৩৩. আব্দুল কাদের, ড. আ.ক.ম., *আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা ও মহানবী (দ.) জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র*, ঢাকা : বি.আই.সি.এস, সীরাত সংকলন, ২০০২, পৃ. ২২-২৩

৩৪. আব্দুল, কাদের, ড. আ.ক.ম, "মদীনা সনদ : একটি পর্যালোচনা, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব ল*', ১৯৯১, খ. ৪, পৃ. ২৫৭-২৬১

৩৫. Hamidullah, Dr. Muhamad, *The First Written Coustitution in the Word,* Lahore : Shah Muhamad Ashraf, 1981, P. 4

৪. বিদায় হজ্জের অমোঘ ভাষণ : বিদায় হজ্জে প্রদত্ত মহানবী স.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। কোন আন্দোলন কিংবা সংগ্রামের মুখে নয়, কোন চাপের কাছে নত স্বীকার করে নয়, সম্পূর্ণ নবুওয়তী দায়িত্ব ও কর্তব্যের খাতিরে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রদত্ত এই ভাষণে তিনি মানবাধিকার বিষয়ে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন তা অবিস্মরণীয়। তিনি বলেন, "আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর তোমাদের নিকট পবিত্র অনুরূপভাবে তোমাদের জীবন এবং সম্পদ ও পবিত্র।"[৩৬]

রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন, কারো নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত থাকলে তা প্রকৃত মালিকের নিকট অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। জাহিলী যুগের সমস্ত সুদ প্রথা রহিত করা হল, কিন্তু মূলধন ফেরত পারবে।"[৩৭] "সম্মতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা অবৈধ।[৩৮] "জাহিলী যুগের সকল রক্তের প্রতিশোধ রহিত করা হল"।[৩৯] ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আর অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি হল একশত উট রক্তপণ আদায়।[৪০] মহানবী স. কর্তৃক মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights (১৯৪৮) এর ৩, ৬ ও ১৭নং অনুচ্ছেদে এবং সংবিধানের ৩২, ৪২, ৪২(১)নং অনুচ্ছেদেও স্থান পেয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে মহানবী স. বলেন, "তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। আবার তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল তোমাদের বিছানায় তোমরা ছাড়া অন্য কেউ যেন না যায় এবং তারা যেন কোন অশ্লীল কাজ সম্পাদন না করে; তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র নির্দেশে তাদের সাথে দাম্পত্যের সম্পর্ক স্থান করে তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করেছ।[৪১]স্বামী স্ত্রীর মানবাধিকার বিষয়টি জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights এর ১৬নং অনুচ্ছেদে এবং International Covenent of Civil and Political Rights (ICCPR) এর ২৩নং অনুচ্ছেদ স্থান লাভ করে।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সীমারেখা নির্ধারণ করে মহানবী স. বলেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আর মুসলিম জাতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

---

৩৬. Harun, Abdus Salam (ed) Tahjib *Sirat Ibn-Hisham,* Kuwait : Dar-al-Buhuth at Islamiyah, 1984, P, 325

৩৭. Ibid, P. 326.

৩৮. Ibid, P. 327

৩৯. Ibid P. 326

৪০. Al-Jahiz-Amrinb Bahr, *Kitab-Al-Bayan wal Tabyyan,* Bairut : Dar al-Firkr, 1968, VOL-1, Purt-2, P. 53

৪১. Harun, Abdus Salam, Ibid, P. 326

অতএব, পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ নয়"।[৪২] মহানবী স. আরো বলেন, "তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। সকলকে আদম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।[৪৩]এভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে অনেক উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। Fyzee বলেন, ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা কেবল প্রচার- প্রোপাগান্ডার মধ্যেই সীমিত নয়; বাস্তব জীবনেও তা অনুসরণের তাগিদ দেয়া হয়। বস্তুত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ইসলামের চিরন্তন সোনালী অধ্যায়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ।[৪৪] জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights-এর ১নং অনুচ্ছেদে মানুষের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

দাস-দাসীদের সম্পর্কে মহানবী স. বলেন, "তোমরা দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। তারা তোমাদেরই ভাই। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তা পরতে দেবে। তাদের উপর কোন প্রকার নির্যাতন চালাবে না, তাদের মনে আঘাত দিবে না।"[৪৫] শুধু তাই নয়, মহানবী স. স্বীয় দাস যায়েদকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের প্রতিপাল্য হিসেবে গ্রহণ করে দাসদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights এর ৪নং অনুচ্ছেদে এবং International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR)-এর ৮নং অনুচ্ছেদেও দাসত্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বংশ কৌলিণ্য ও বর্ণবাদ বিষয়ে মহানবী স. বলেন, "কোন অনারব ব্যক্তির ওপর কোন আরববাসীর এবং কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া।"[৪৬] উক্ত বক্তব্যে মহানবী স. বংশ কৌলিণ্য বর্ণবাদ প্রথাকে স্থান দেননি।

১৯৬৫ সালের ২০ নভেম্বর The Declaration on the Elemination of all forms of Racial Discrimination এর অনুচ্ছেদ-১-এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য হল মানব মর্যাদার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং তা United Nations Charter ও The Universal Declaration of Human Rights এর পরিপন্থী এবং জাতিসমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের পথে বাধা স্বরূপ।[৪৭]

---

৪২. Ibid, P. 327

৪৩. Al-Jahiz-Amrinb Bahr, *Kitab-Al-Bayan wal Tabyyan*, P. 16

৪৪. Fyzee, Asalf, A.A., *Out lines of Mohammadan Law*, London : Oxford University Press, Introduction, P. 13.

৪৫. Bukhari, Abu Abdullah Ismail, Ibid, VOL. 1, P. 9

৪৬. Al-Jahiz-Amrinb Bahr, *Kitab-Al-Bayan wal Tabyyan*, P-54

৪৭. বেরা মণ্ডল ও মো. শাহজাহান মন্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানবাধিকার : বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত The Universal Declaration of Human Right-এর উত্তরাধিকার লালন করছে। বিশ শতকের প্রথম থেকেই মানব সভ্যতা অত্যন্ত অসহায়ভাবে দু'দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। মানবাধিকারের ললাটে কালিমা লেপন করে এতে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশু বর্বরতম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। অতঃপর ভার্সাই চুক্তি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪৮] প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একনায়কত্ব ও ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার প্রেক্ষাপটে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সৃষ্টিকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বসমাজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। ফলে নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতি আন্তর্জাতিক চেতনা সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতি সংঘের সনদ প্রণয়নকালে এর স্থপতিগণ মৌলিক মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও মানুষের মর্যাদার প্রতি তাঁদের আস্থা ব্যক্ত করেন।[৪৯]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সভায় ৩০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় তার ৩ থেকে ২১ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহে ১৯টি নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার স্থান পেয়েছে এবং এর ২২ থেকে ২৭ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহে ৬টি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মানবাধিকারের এই সর্বজনীন ঘোষণা গৃহীত হওয়ার পর স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রায় সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে উক্ত ঘোষণাপত্রে বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছে। জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য মানবাধিকারের এই সনদ অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে নি। কিন্তু এটি অনুমোদন লাভ করার পর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এতে স্বেচ্ছামূলক স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক নিজ নিজ দেশে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। কোন দেশ এই সনদ কতটুকু অনুসরণ করছে তা পর্যবেক্ষণও এ সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদানের জন্য জাতিসংঘ একটি স্থায়ী মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কমিশনের শাখা রয়েছে যার মাধ্যমে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার বিষয়ক যাবতীয় রিপোর্ট অবহিত হয়।

বিশ্বপ্রেক্ষাপটে মানবাধিকার লংঘন ও নির্বাসনের একটি সমীক্ষা : মানবাধিকার সংরক্ষণের এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বর্তমানে বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এর মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জিং অধ্যায় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স,

---

৪৮. আহমদ, ড. এ.বি.এম শামসুদ্দীন, *মদীনা সনদের আলোকে মানবাধিকার ঘোষণা*, তা. বি. পৃ. ৮০

৪৯. রেবা মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১

ইতালী ও চীনকে 'ভেটো' প্রয়োগের নিরংকুশ ক্ষমতা প্রদান করে নিজেই মানবাধিকার লংঘনের নজীর স্থাপন করেছে। পৃথিবীর পরাশক্তিসমূহ বিশেষতঃ আমেরিকা ও ব্রিটেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার করুণ শিকারে পরিণত করেছে। অথচ এরাই জাতিসংঘ ও মানবাধিকার কমিশন নিয়ন্ত্রণ করে। আর পুতুলসম জাতিসংঘেরও এমন কোন সংস্থা বা মেকানিজম নেই যা দেশে দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে কিংবা আইন দ্বারা তা মানতে বাধ্য করতে পারে। ফলে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায়, কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষত আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তি দুর্বল দেশসমুহে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘন করে চলছে। মুসলিম জাতিসত্তাকে নির্মূল করাই যেন তাদের মিশন। মানবাধিকার সনদকে পদতলে পিষ্ট করে আফগানিস্তান ও ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর নগ্ন আগ্রাসন, গণহত্যা, স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা হরণ, সিরিয়া, ইরান ও সৌদি আরবের প্রতি মার্কিন হুমকি, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্ব বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, ফিলিস্তীনে ইসরাইলী আগ্রাসান ও দমন-পীড়ন, আলবেনিয়ায় গণহত্যা, স্বাধীনতাকামী কাশ্মীর ও মিন্দানাওয়ে মুসলিম নিধন, মায়ানমারে মুসলিমদের ওপর জেল-জুলুম ও নির্যাতন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও কোন কোন দেশে ঘন-ঘন সামরিক শাসন জারী, আমেরিকায় মুসলিম ও নিগ্রোদের প্রতি বৈরী আচরণ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে নাগরিক অধিকার হরণ, দেশে দেশে বোমাতংক এবং সামাজিক নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অস্থিতিশীল বিশ্ব পরিস্থিতি আজ জাতিসংঘের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং বিশ্ব মানবাধিকার পরিস্থিতিকেও আজ বিপর্যয়কর অবস্থার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। ফলে মনে হয়, গুটি কয়েক রাষ্ট্রকে ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতা প্রদান করে জাতিসংঘ এসব রাষ্ট্রকে তার সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ হতে ফায়দা লুটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থা বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, আদর্শিক অসচেতনতা, সামাজিক পশ্চাদপদতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনগ্রসরতা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের মাঝে ঐক্য ও সংহতির অভাব আজ সুস্পষ্ট। ফলে তারা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ হতে পুরোপুরি ফায়দা উঠাতে পারছে না। এমতাবস্থায় উপরোক্ত দুর্বলতাসমূহ কাটিয়ে উঠে মুসলিম উম্মাহ যদি কেবল মহান আল্লাহ প্রদত্ত এবং মহানবী স. প্রদর্শিত শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং মহানবী স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্রের মডেলে মানবাধিকারের শিক্ষা ও নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে তা হলে বিশ্ববাসীকে মানবাধিকারের গ্যারান্টি দিতে সক্ষম হবে।[৫০]

---

৫০. আব্দুল কাদের, ড. আ.ক.ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার এই উদাহরণ রসূলুল্লাহ স.-এর জীবনের শুরু থেকেই আজীবন নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি গোটা আরব জাহানের নেতা হয়ে উঠলেন তখন তিনি কি সমাজজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনে, কি বিশ্ব নাগরিক হিসাবে–সর্বক্ষেত্রে মানুষের মূল্য-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকারের যে সর্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল, অভূতপূর্ব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীতি-দর্শনের কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

মানবাধিকার ও ইসলামী নীতিমালা (Islamic Principles)

১. নিরাপদ জীবন-যাপনের অধিকার : মুহাম্মদ স. মানুষের জীবনের অধিকার ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। নরহত্যা যেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল সেখানে নরহত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, "সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা এবং মানুষকে হত্যা করা।"[৫১]
মহানবী স. আরো বলেছেন– "কোন যিম্মীকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।"[৫২] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী স. বলেছেন, "হে মানবজাতি! নিশ্চয় তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত পবিত্র।"[৫৩] মহানবী স. আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং আত্মহত্যাকারী তার নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেয়ার শাস্তি হিসাবে আত্মহত্যার অনুরূপ পন্থায় দোযখে শাস্তি ভোগ করবে বলে হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছেন।[৫৪]

২. বিবাহ ও পারিবারিক জীবনযাপনের অধিকার : মুহাম্মদ স.-এর জীবন দর্শনে সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "বিবাহ আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নতের প্রতি অনাসক্ত সে আমার আদর্শভুক্ত নয়।"[৫৫] কৌমার্যব্রতকে প্রত্যাখান করে তিনি বলেছেন: "ইসলামে

---

৫১. আল-হাদীস, উদ্ধৃত, M. Ershadul Bari, Human Rights in Islam with Special Reference to Women Right, International Human Rights in Islam" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ১৯৯৪, ঢাকা : পৃ. ১৮

৫২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, মো. আব্দুল করিম খান সংকলিত, ঢাকা : বাংলাদেশ লাইব্রেরী ১৯৯৬, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১২৭৭

৫৩. আহমদ, মুহাম্মদ শফিক ও মু. রুহুল আমীন, ইসলামে মানবাধিকার : নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যা ৪৭, ৪৮, ৪৯, অক্টোবর ৯৩-জুন ৯৪, পৃ. ১৫৮

৫৪. বুখারী, ইমাম, আস-সহীহ, মো. আব্দুল করিম খান সংকলিত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৫১-১২৫৩

৫৫. প্রাগুক্ত

সন্নাসবাদ ও বৈরাগ্য প্রথার অনুমোদন নেই।[৫৬] প্রকৃতপক্ষে ইসলামে 'বিবাহ' কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয় বরং পারস্পরিক ভালবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রসূলুল্লাহ্ স. প্রবর্তিত বিবাহব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক চুক্তি যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও ইসলামে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৫৭]

বিবাহের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীই হল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের উপরই প্রাথমিকভাবে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সুখ নির্ভরশীল তাই পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে– "তাঁরা (স্ত্রীগণ) তোমাদের (স্বামীদের) ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ"[৫৮]

৩. সম্পদের মালিকানা : রসূলুল্লাহ্ স. প্রবর্তিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজবাদ বা পুঁজিবাদ কোনটিকেই সমর্থন করে না এখানে সীমিত পরিসরে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্র। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (trustee) হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বন্টনের অধিকার লাভ করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে"।[৫৯] দান-খয়রাত, সদকা, যাকাত, ফিতরা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ধিত সম্পদের বিলি-বন্টন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কেবল বলাই হয়নি, রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর জীবনে কার্যকরভাবে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলামী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক শোষণ বা সংঘর্ষ নির্ভর নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণমূলক ও ভ্রাতৃত্বসুলভ। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে"।[৬০]

৪. দাসত্বের গোলক ধাঁধা থেকে স্বাধিকার : দাসত্বের পরাধীনতা মানবেতিহাসের এক চরম অমানবিক ও অবমাননাকর অধ্যায়। এর প্রচলন ছিল বিশ্বব্যাপী এবং ১৮৯০ সালে ব্রাসেলসে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ কনফারেন্সের আগ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়নি। "মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়"– এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্লেটো ও এরিস্টোটল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের অধিকাংশ দার্শনিক দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন। দাস প্রথা সম্পর্কে এরিস্টোটলের

---

৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. প্রাগুক্ত
৫৮. আল-কুরআন, ২ : ১৮৭
৫৯. আল-কুরআন, ৭০ : ২৪, ২৫
৬০. আহমদ, মুহাম্মদ শফিক ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

মতামত উল্লেখ করে Abdullah Kannoum বলেছেন– "In his opinion, mankind consisted of two categories-the free and the slaves and to him some people were slaves by their very nature.[৬১] গ্রীক, রোমান, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহে ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মে এমনকি আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাতেও প্রথমদিকে দাস প্রথা স্বীকৃত প্রথার মর্যাদা পায়।[৬২] এ থেকে অনুমিত হয় যে, এ প্রথাটির নৈতিকতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রাথমিক কৃতিত্ব মহানবী স.-এরই প্রাপ্য।

মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ স. সেই সপ্তম শতাব্দীতেই এ প্রথার বিরোধিতা ও এর বিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁর দর্শন ছিল, সমগ্র মানব জাতি একজন নারী ও পুরুষ থেকে উদ্ভূত, সুতরাং জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন।

তিনিই সর্বপ্রথম দাসমুক্ত করেন এবং দাসমুক্ত করাকে বিশেষ সওয়াবের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করলে সাহাবীদের মাঝে দাস মুক্তির হিড়িক পড়ে যায়। স্বয়ং নবী স. ৬৭ জন, আবূ বকর রা. অসংখ্য, ওমর রা ১০০০, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা ৩০,০০০, দাস-দাসীকে মুক্তিদান করেন। মানুষে মানুষে এই সমতা বিধানের মহত্তম আদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়ে Dr. Ahmad Golwash তাঁর "The Religion of Islam" গ্রন্থে বলেন, "Equality of right-was the distinguishing feature of the Islamic Commonwealth. A convert from an humble clan enjoyed the same rights and privileges as one who belonged to the noblest Korasish.[৬৩]

বর্তমানে দাসত্ব তথা দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা সভ্য সমাজ মুখে বললেও এটিকে তারা বাস্তবে জিইয়ে রেখেছে। আমেরিকা তার সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে, বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা, সুরম্য জনপদ, প্রশস্ত সড়ক, বিশালাকার শিল্প-কারখানা ইত্যাদি নির্মাণে আফ্রিকা থেকে বহুসংখ্যক দাস আমদানি করে। সে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং কিছুটা ভিন্ন আকারে। ১৭৭৬ সনের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলতে গিয়ে Claude M. Lightfood বলেন–

"Black remained slaves until about 80 years later, women did not recieve the right to vote unitl 112 years later and the working class did not get the legal right to organise and collectively bargain until 150 years later.[৬৪]

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Bosworth Smith তাঁর "Mohammed and Mohamadanism" গ্রন্থে বলেন–

"It recognised individual and public liberty, secured the person and property of the subjects and postered the growth of all civic virtues. It communicated all the privileges of the conquering class to those of the conquered who conformed of

---

৬১. Kannomn, Abdullah Islam is the first Anti-Slavery Religious System of the world, *The Islamic Review Journal*, Working Survery, England, July-August 1966, P. 37

৬২. আহমদ, মুহাম্মদ শফিক ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৬৩. রহমান, মুহাম্মদ মতিউর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৬৪. প্রাগুক্ত

its religion, and all the protection of citizenship to those who did not. It put an end to old customs that were of immoral and criminal character. It abolished the inhuman custom of burying the infant daughters alive, and took effective measures for the suppression of the salve-traffic.[৬৫]

৫. স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার : মুহাম্মদ স. প্রবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। একইভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাইরে যাওয়া ও অন্য রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও প্রতিটি ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা' ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। রসূলুল্লাহ্ স.-এর রাষ্ট্র দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্র রাজ্যস্বরূপ– যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্যে অবারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সমগ্র দেশ আল্লাহ্র আর মানুষ আল্লাহ্র বান্দা, তুমি যেখানে মঙ্গলজনক মনে কর বসবাস কর।[৬৬]এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের সর্বজনীন স্বাধীনতা ছিল।

রসূলুল্লাহ্ স. প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে 'ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না-এ শর্তে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্বের অধিকার দেয়া হয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজির জনগণকে মদীনায় আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। মুহাম্মদ স.-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র আশ্রয়প্রার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়।[৬৭]

৬. নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন ব্যক্তিকে শারীরিক-মানসিক শাস্তিদান বা তাকে কষ্ট দেয়াকে রসূলুল্লাহ্ স. সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কথা বা হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকবে।[৬৮]

এমনকি এক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ়তায় তিনি বলেছেন– "মনে রেখো! যদি কোন মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্র আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।"[৬৯]

---

৬৫. প্রাগুক্ত

৬৬. আহমদ, মুহাম্মদ শফিক ও মুহাম্মদ রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, ১৬৩

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৬৮. খাতীব আত্ তাবরীয়ী, ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ, আল-*মিশকাতুল মাসাবীহ*, কলিকাতা : এম. বশির হাসান এ্যাণ্ড সন্স, তা.বি, খ. ১, পৃ. ১২

৬৯. রহমান, মো. আতাউর, ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৪৬, জুন. ১৯৯৩, পৃ. ৪৩

৭. সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিতকরণ : ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার দিয়ে মহানবী স. বলেছেন– "অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবনের এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতোই।" তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি অধিকার ইসলাম স্বীকার করে। মদীনা সনদ অমুসলিমদের মদীনায় বসবাসের অধিকার দিয়েছিল। এমনকি, তাদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও বাকী অংশের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়নি। ইসলাম একজন অমুসলিম শ্রমিককে একজন মুসলিম শ্রমিকের মতই সুযোগ-সুবিধা দেয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী স. বলেছেন, "সতর্ক থাক, সে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি অমুসলিমদের উপর জুলুম করে অথবা তাদের হক নষ্ট করে অথবা তাদের সামর্থ্যের চাইতে বেশী কাজের বোঝা চাপাতে চেষ্টা করে অথবা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের থেকে কিছু জোরপূর্বক নেয়, আমি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব।[৭০]

অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও গালমন্দকে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা যারা করে তাদের উপাস্যদের তোমরা গালি দিয়ো না।"[৭১]

৮. গণতান্ত্রিক অধিকারের গোড়াপত্তন : মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, ন্যায়সঙ্গতভাবে সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া যায়। উমর রা.-এর খিলাফতকালে খলীফা জুমুআর খুতবা দিতে মিম্বরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে এক মুসল্লী জানতে চাইলেন খলীফার জামা এত লম্বা হলো কীভাবে ? কারণ বায়তুলমাল থেকে সকলকে যে কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে এতো লম্বা জামা বানানো যায় না। প্রশ্নকর্তা যখন জানলেন, খলীফার ছেলের ভাগে যে কাপড় পাওয়া গেছে সেটা খলীফাকে দেয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে লম্বা জামা বানানো সম্ভব হয়েছে তখন প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, হ্যাঁ এখন খুতবা শুরু করুন। আমরা শুনবো। খলীফা বললেন, যদি সন্তোষজনক জবাব না পেতে তাহলে কী করতে? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন : তখন আমার এই তলোয়ার এর সমাধান দিতো। একথা শুনে খুশী হয়ে খলীফা বললেন– হে আল্লাহ্! যতদিন পর্যন্ত এরূপ সাচ্চা ঈমানদার বান্দা জীবিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।[৭২]

৯. ন্যায়বিচার লাভের অধিকার : মুহাম্মদ স. প্রবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক-সামাজিক-পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে। মূলত ন্যায়বিচার ধারণার উপর ইসলামে এতটা গুরুত্ব আরোপ

---

৭০. রহমান, মুহম্মদ মতিউর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৭১. আল-কুরআন, ৬ : ১০৮
৭২. রহমান, মুহাম্মদ মতিউর, পৃ. ৩৬

করা হয়েছে যে, কুরআনে প্রায় ষাটটি আয়াতে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে যদি তোমাদের পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি হয় তবুও।"[৭৩] রসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত শাসনামলে ইসলামের বিচারব্যবস্থা যা শাসক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ মুক্ত, স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে, তা ছিল মূলত রসূলুল্লাহ স.-এর মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত। মনীষী বার্ক এ সম্পর্কে চমৎকারভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।
তাঁর ভাষায়– The Muhammedan Law is binding upon all, from the crowned head to the meanest subject. It is a aw interwoven with a system of the wisest, the most learned and most enlightened jurisprudence that has ever existed in the world.[৭৪]

সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ স. : উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজ ও মানবিকতার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ স. যে অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন তা মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এমন কতগুলো ক্ষেত্র এখানে আলোচনার দাবী রাখে।

১. শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় রসূলুল্লাহ্ স.-এর বাস্তবমুখী পদক্ষেপ : কুরআনে আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মদ স. সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, "আমি তোমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৭৫] কুরআনের এ বাণী পরিপূর্ণভাবে সত্যে পরিণত করেছিলেন রসূলুল্লাহ্ স.। সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অনন্য উদাহরণ রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজো অদ্বিতীয় ও অনুকরণীয়। কেননা তিনি কেবল মুসলমানদের আদর্শ ছিলেন না, ছিলেন গোটা মানব জাতির আদর্শ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন– "বলুন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্র রসূল।[৭৬]

মুহাম্মদ স. ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যিনি অতি শৈশবে বিস্ময়করভাবে সমবণ্টন নীতিতে তার দুধ মা হালিমার ঘরে দুধ মাতার একটি মাত্র স্তন পান করতেন আর একটি রেখে দিতেন হালিমার নিজের সন্তানের জন্যে।[৭৭]

সমগ্র মক্কাবাসী যখন তাদের দ্বারা নির্যাতিত, বিতাড়িত, চরম প্রতিহিংসার শিকার মুহাম্মদ স.-এর হাতে চরম দণ্ড পাওয়ার আশংকায় প্রহর গুণছিল, সেদিন শান্তির দূত মুহাম্মদ স. নিঃশর্ত ক্ষমা করে দয়া ও ক্ষমার অপার মহিমান্বিত ইতিহাস রচনা

---

৭৩. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫
৭৪. আলী, সৈয়দ আশরাফ, *সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ*, *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭, পৃ. ২৪
৭৫. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭
৭৬. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৮
৭৭. কায়্যুম, অধ্যাপক হাসান আব্দুল, *শান্তির দূত হযরত স.*, *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫, পৃ. ৩৮

করেন। ঐতিহাসিক গিবনের ভাষায় বলা যায়– In the long history of the world there is no instance of magnamity and forgiveness which can approach those of Muhammad (s) when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all.[৭৮]

২. দয়া, ক্ষমা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রসূলুল্লাহ্ স.-এর অনন্য পদক্ষেপ : মহানবী স. ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল ও কোমল। দয়া, ক্ষমা, শান্তি ও সাম্যের প্রতিরূপ এই মহামানব স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন না।"[৭৯]এখানে কেবল মুসলমানদের কথাই নয় বরং সমগ্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনকে তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। অন্য একটি হাদীসে মহানবী স. বলেন : "পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর। ঊর্ধ্বলোকে যারা আছেন তারা তোমার প্রতি সদয় হবেন।"[৮০] অন্যদিকে শ্রমিক, অধীনস্থ কর্মচারী ও চাকর-চাকরানীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, তাদেরকে নিজেদের অনুরূপ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেও তিনি বার বার তাগিদ দিয়েছেন। বস্তুত বিশ্বনবী স. শ্রমিকদের সব প্রকার বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন আর গ্লানির অবসান করে এমন সব শ্রমনীতির প্রবর্তন করে গেছেন যার সিকি শতাংশও জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই.এল.ও) বিগত ১১৮ বছর ধরে মে দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।[৮১]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ স. স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন– "শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।"[৮২]

মহানবী স. এভাবে শান্তি, মৈত্রী, ক্ষমা, দয়া, শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন– মানব মর্যাদা ও মানবাধিকারের ধারণা ও তা অর্জনের ক্ষেত্রে তা এক অতুলনীয় দিক-নির্দেশনা। তাঁর এই গুণাবলি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মুগ্ধ বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক জর্জ বার্নড শ' তাই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি– "If all the world was united under one leader, Mohammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness.[৮৩]

৩. নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রসূল স.-এর গৃহীত কর্মপন্থা : নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে আমরা হয়ত কেট মিলে(Kate Millet), জার্মেন

---

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৭৯. রহমান, শেখ ফজলুর, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মহানবী স., *সীরাতুন্নবী স. স্মরণীকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭, পৃ. ১৮

৮০. রহমান, শেখ ফজলুর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯

৮১. হোসেন, মুহাম্মদ ফরহাদ, মে দিবস, শ্রমিক শ্রেণী এবং ইসলাম, *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ১২

৮২. হোসেন, মুহাম্মদ ফরহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮৩. কাইয়ুম, অধ্যাপক হাসান আব্দুল, প্রাগুক্ত পৃ. ৪২

গ্রীয়ার (Germaine Greer) বা অ্যানী নূরাকীন (Anne Nurakin) প্রমুখের নাম জানি; এছাড়াও রয়েছে মেরী উলষ্টন, অ্যানী বেসান্ত, মার্গারেট সাঙ্গাঁর, সুলতানা রাজিয়া, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দেন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণ আকারে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির যিনি প্রবক্তা তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মদ স.। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধু নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশ্ব মনীষায় মুহাম্মদ স.-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।[৮৪]

নারীর প্রতি রসূলুল্লাহ্ স.-এর দর্শন এসেছে মূলত কুরআনের নীতি-দর্শন থেকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্মকালে নারীকে বিশ্বের কোথাও এমনকি স্বাধীন মর্যাদাবান মানুষ হিসেবেও বিবেচনা করা হতো না। নারীকে 'ভোগের বস্তু' 'লাঞ্ছনা' ও 'পাপের প্রতিমূর্তি' এবং কোথাও কোথাও অন্যান্য অস্থাবর সম্পতির মত 'সম্পত্তি' মনে করা হতো। কুরআনে সূরা আন-নাহল-এ আল্লাহ্ তাআলা তৎকালীন সমাজে নারী সম্পর্কে মানুষের মানসিকতাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়, সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তা রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে দেবে।"[৮৫]

এভাবে নারীর প্রকৃত মুক্তি, তার স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী স. এক অনন্য সাধারণ দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন যা বর্তমান নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির ধারণার চেয়ে বহুগুণে উন্নত, পরিণত ও সুদূর প্রসারী। প্রখ্যাত লেখিকা নাসিমা খাতুন তার একটি গবেষণা নিবন্ধে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন– "Within the twenty-three years during which the prophet Muhammad (peace be upon him!) promulgated the Message of Islam, the position of position of woman was raised from the lowest degradation to the greatest heights of esteem, honour and respect"।[৮৬] রসূলুল্লাহ্ স.-এর প্রতিষ্ঠিত নারী স্বাধীনতা ও নারী মর্যাদাকে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মমত ও জীবনদর্শনের সাথে তুলনা করে নাসিমা দেখিয়েছেন যে, "...compared to all other civilizations and law of the world Islamic law has given women her rights to the highest degree, before everybody

---

৮৪. আলী, সৈয়দ আশরাফ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭, পৃ. ২৩

৮৫. আল কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯

৮৬. Nasima Khatun, The status and Righyts of Women in Islam, *Social Science Review*, A Journal of the Faculty of Social Science, University of Dhaka, VOL-XVI, No. 1, June 1999, P. 410

also and most disinterestedly and recognized her ture dignity".[৮৭] মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট এর মতে, "He (Muhammad) was probably the greatest champion of womens rights the world has ever seen"[৮৮]

৪. পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা : অনেক ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে কেটেছে তা জানা যায় না। কিন্তু মুহাম্মদ স.-এর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির' পথ তিনি পরিহার করে চলেছেন। বরং তাঁর মতে পরিবার ও সমাজে শান্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার ও আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত ধর্মাচরণ। আমরা ইতঃপূর্বে 'বিবাহ' ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারের ভিত্তি রচনা, পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানো এবং কন্যাকে অধিক গুরুত্বদান, স্ত্রীর অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর জীবন-দর্শন আলোচনা করেছি– যেখানে দেখা গেছে মানুষের জীবনের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে অধিকার ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সম্পর্কে অন্য কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা হলো–

ক. মানবাধিকারের এই উচ্চকণ্ঠের যুগে পরিবার-ব্যবস্থা ক্রমশ যেখানে দুর্বল হয়ে পড়ছে নগরায়ণ ও শহরায়নের পাশাপাশি লাগামহীন ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অন্যান্যদের প্রতি ক্রমশ নিরাপত্তাহীনতা, অধিকার না পাওয়ার ও লাঞ্ছনার আশংকা বাড়ছে। অথচ রসূলুল্লাহ স. দৃঢ়ভাবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তাগিদ দিয়েছেন। কুরআনে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক ও দায়িত্বের কথা স্পষ্ট ঘোষণা করে বলা হয়েছে– "তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ', বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে।"[৮৯]

খ. মুহাম্মদ স. নিজ মা-বাবার সম্মান-মর্যাদা ও পরিবারে তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি কুরআনের নির্দেশনার আলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলতেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ব্যতীত বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত হবে না"[৯০] নিজের পরিবারে যিনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ও সকল সদস্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না তিনি যতই জগৎ জয় করুন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারবেন না- এটিই মহানবী স.-এর জীবন দর্শন। অন্যদিকে তাঁর মতে পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদাও অনেক

---

৮৭. Nasima Khatun, Ibid, P-413

৮৮. আলী, সৈয়দ আশরাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৮৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩

৯০. যফীরুদ্দীন পূরানুহাভী, মাওলানা মুহাম্মদ, *ইসলামের যৌন বিধান*, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ২৭

উঁচুতে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উৎকৃষ্ট এবং পরিবার পরিজনদের সাথে সহনশীল ব্যবহার করে"।[৯১] তাঁর যুগে এই কথা বলা ও পরিবারে তার অনুশীলন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ।

৫. বৃহত্তর সমাজ-জীবনে শান্তি, সাম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা : মুহাম্মদ স. নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের পর দৃঢ়ভাবে প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মেহমানদের অধিকারও তিনি নির্ধারিত করেছেন। তাঁর মতে "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষদিনে ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং অবশ্যই ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[৯২] মানুষ আজকের দিনেও তার অন্যান্য প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে মুক্ত নয়–তা সে সমাজ জীবনে হোক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক। অথচ নবী করীম স. বার বার প্রতিবেশীর–তা সে যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্রেরই হোক না কেন–সন্তুষ্টি ও তার সাথে ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন।

বৃহত্তর সমাজ জীবনেও তিনি শান্তি, সাম্য, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করেছেন বিশ্ববাসীকে। তাঁর সমাজ দর্শন এমনই যে, "মানুষ সহজ সরল বিনয়ী জীবনযাপন করবে। আচার-আচরণ, চলাফেরা ও কথাবার্তায় সে এমনভাবে থাকবে, যেন অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না পায়। মজলিসে বসলে এমনভাবে বসবে যেন নিজেকে মজলিসের প্রধান মনে না হয়।"[৯৩]

৬. অসহায়-বঞ্চিত-ইয়াতীম ও বিধবাদের অধিকার : মুহাম্মদ স. সমাজে ইয়াতীম, বিধবা অসহায়দের অধিকার রক্ষার ও তাদের কল্যাণে সারা জীবন কাজ করে গেছেন এবং অন্যকেও তেমনি দায়িত্ব পালনের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "ক্ষুধার্তকে খাবার দিও, পীড়ত ও রুগ্নকে দেখতে যেও এবং মুসলমান হোক কি অমুসলমান, সকল নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করো।"[৯৪] ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকে উৎসাহিত করতে তিনি বলেছেন– "আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী বেহেশতে এভাবে থাকব।" তিনি আরো বলেছেন– "বিধবা এবং গরীব-মিসকীনদের সাহায্য-সহায়তার চেষ্টা সাধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী অথবা দিনভর রোযা ও রাতভর নামায আদায়কারীর অনুরূপ।" এ হাদীসটিতে দেখা যায়, অপরিহার্য 'ইবাদত এর সাথে গরীব-মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্য ও সেবাদান

---

৯১. আসমা, খাতুন হাফেজা, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী স., *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫, পৃ. ৫১

৯২. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৫০৯।

৯৩. থানবী, মাওলানা আশরাফ আলী, *কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন*, মাওলানা আবু তাহের রহমানী অনূদিত, ঢাকা : বাগদাদ লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃ. ১০২

৯৪. ইসলাম, মাওলানা আমিনুল, *মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী স.*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৭

করাকে সমতুল্য ঘোষণা করে তাদের অধিকার আদায়ের পথ সুপ্রশস্ত করেছেন। মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ স. ইয়তীম, অসহায়দের সম্পদ হরণ করাকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন– "ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা মানুষের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসকারী পাপের মধ্যে গণ্য হবে।"[৯৫] রাগ বা ক্রোধ যা প্রায়শই আমাদের সমাজ জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে তিনি সর্বান্ত করণে দমন করতে বলেছেন। এভাবে পরনিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা রটনা, চুরি এমনকি অযথা সন্দেহ করাকেও নিষিদ্ধ করেছেন তিনি।

৭. শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী স. : ইসলাম কল্যাণময় জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল স্তর ও সকল বয়সের জন্য শান্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ ইসলামে বিদ্যমান। মানবজীবনের মূলভিত্তি হল শৈশবকাল। তাই ইসলাম শৈশবের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শিশু সন্তানের গুরুত্বারোপে আল-কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে–" ধন-ঐশ্বর্য ও শিশু সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা"[৯৬]

শিশুর খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি শিশুকে জাগতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, পারিপার্শ্বিক, শিষ্টাচার, আক্বীকা, খতনা, সুন্দর একটি নাম নির্ধারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষায় উজ্জীবিত করা প্রতিটি পিতামাতার অন্যতম দায়িত্ব।

নবী স. বলেন, "কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।"[৯৭]

উপসংহার : বর্তমানে জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও বিশ্বের প্রায় ছয়শ কোটিরও অধিক মানুষ আজ চরম ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নাগরিক অধিকার দলন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদির যাঁতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছে। দেশে-দেশে, জনপদে আজ ঐক্যবিধ্বংসী সন্ত্রাস, হত্যা-রাহাজানি, মারামারি-হানাহানি, নৈরাজ্য, যুদ্ধের বিভীষিকা, তথাকথিত মানবাধিকারে ধ্বজাধারীদের ব্যবহৃত মানবতাবিধ্বংসী অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের কবলে আজ সারাবিশ্ব চরম হুমকীর সম্মুখীন। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত এবং রসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত মানবাধিকারের আদর্শই কেবল বিশ্ব মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতা সর্বজনীনভাবে নিশ্চিত করতে পারে। ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব বিনির্মাণের পথে ঐক্যবদ্ধ ঈমানী প্রতিজ্ঞা-প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে বিশ্বের প্রতিটি বনী আদমের মানবাধিকার ততো তাড়াতাড়ি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

---

৯৫. ইসলাম, মাওলানা আমিনুল, *মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী স.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৯৬. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

৯৭. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ১৫৯

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট
ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট
ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট
ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট
ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন্স প্রজেক্ট
ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট
ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট
ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট
ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় .... কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

....

বয়স .... পেশা ....

ফোন/মোবাইল : .... সহজলভ্য মাধ্যম :

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর
গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-০৬১৬২১
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
গঋঅ-১১০৫১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➪ ১ বছরের জন্যগ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ × ৪ = ৪০০/-
➪ ২ বছরের জন্যগ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ × ৮ = ৮০০/-
➪ ৩ বছরের জন্যগ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ × ১২ = ১২০০/-

REG : NO : DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : JULY-SEPTEMBER : 2011